শরৎচন্দ্রের
শেষপ্রশ্ন
বেনু মিত্র

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নকে বোঝা সহজ হয়নি, তাই বহুজনেই এর প্রতি বিরূপ। কেবল বিরূপ নন, এর অবাস্তবতা, অসম্ভাব্যতা ও ব্যর্থতা তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এর প্রতিটি ঘটনার মধ্যে যে জীবনের কত কথাই লুকিয়ে আছে, তাদের বাস্তবতা যে কোথায় এবং তাদের অসম্ভাব্যতাই যে কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দ্যোতনা করছে, বর্তমান সমালোচনাটি তা নিপুণভাবে প্রকাশ করছে। উচ্ছলিত কমল নারী জীবনের এবং সমস্ত জীবনেরই কোন্ তত্ত্ব ব্যক্ত করেছে এবং ক্লান্ত কমলের ব্যর্থতাই বা কেন? আত্মসমাহিত আশুবাবুই বা জীবনের কোন্ দিককে রূপ দিয়েছেন?—এই সমস্ত কথাই এই সমালোচনাটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের বেগধর্ম ভারতের সমস্ত শাস্ত্র-ব্যবস্থার ধামাচাপা থেকে মাথা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু সেকি শুধুই একটি ধ্বংসাত্মক শক্তির বিচ্ছুরণ? প্রাণের এই জয়-যাত্রা, বৌদ্ধদর্শনের এই ক্ষণ-বিজ্ঞান আত্মসমাহিতি লাভ করতে পারে যে কেবলমাত্র বেদান্তের সাতত্য-বাদের সহযোগেই, বর্তমান সমালোচনাটি তাই প্রমাণ করে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন

শ্রীরেণু মিত্র এম, এ

জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

শরৎচন্দ্র তাঁর "শেষপ্রশ্নে" সেইদিন যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলেন, আমাদের পক্ষে আজও তা জিজ্ঞাসা হয়েই আছে। তবে তার জবাব পাওয়ার মত ও তা উপলব্ধি করবার মত চারদিকের হাওয়া আজ ক্রমেই অনুকূল হয়ে উঠছে। বস্তুধর্মের পারস্পরিক বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতার ঐকান্তিকতা থেকে যে জিজ্ঞাসার জন্ম, বস্তুধর্মের পারস্পরিক পরিপূরকতার মধ্যেই তার জবাব। পারস্পরিক বৈপরীত্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট, ক্ষণের সঙ্গে চিরকালীনত্বের আর একের সঙ্গে বহুর বিরোধ আমাদের চোখে উজ্জ্বল। এই বিরোধের দ্বন্দ্বে মানুষ উৎপীড়িত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের একান্ত করে চাওয়া আর একান্ত ছেড়ে যাওয়ার দ্বন্দ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলতে পারলেন, "এ দু'য়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল।" চাওয়া আর ছেড়ে যাওয়ার এই কোনোখানের কোনো মিলটি যে কোথায় কেমন ক'রে সম্ভব, তারই আলোচনা করেছি শরৎচন্দ্রের চাওয়া আর না-পাওয়ার পটভূমিকায়। এই চাওয়া আর না-পাওয়ায় মেশানো জীবনের পক্ষে বস্তুধর্মের পারস্পরিক বিরুদ্ধতা সত্য, বিরুদ্ধধর্মের প্রতিটির স্বয়ংমূল্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সত্য এবং তাদের মধ্যেই পারস্পরিক পরিপূরকতাও সত্য—এই এতখানি বললেই সমগ্র জীবনের কথা বলা হয়, আর সেইখানে সকল শেষপ্রশ্নের জবাব মিলতে পারে।

জীবনের এই সমগ্রতার খোঁজ পেয়েছি স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

অবধূত মহারাজের কাছে। তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্য-গোপালদেবের জীবন ও লিখিত সূত্র থেকে আজকের দিনের দর্শনশাস্ত্রের এই শেষ কথাকে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রস্থাপিত করেছেন। যাকে আমরা এতদিন কেবল পরস্পর-বিরুদ্ধ বলেই জেনে এসেছিলাম, সমগ্র জীবনের বাতায়ন থেকে তাকে তিনি জীবনেরই মূল্যে দেখতে পেলেন। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রশ্নের আজ আর অন্ত নেই; বিশ্বের এই জটিলতার সমাধানে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের এই চিন্তাধারা আজ পরম প্রয়োজন।

এই সমগ্র জীবনেরই হাওয়া আজ পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। পৃথিবীর ইতিহাস আজ আর শুধু বেঁচে থাকারই নয়, তার আজকের ইতিহাস সংস্কৃতির। আজ যখন শুধু বেঁচে থাকা ও সংস্কৃতির গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব সভ্যতার আকাশকে ঘোলাটে করে তুললো, তখন সেই অনিশ্চয় পদক্ষেপগুলির সম্মুখে ঐ জীবনেরই এই আর একটি প্রদীপ আমি জ্বালিয়ে দিলাম। যুগসন্ধিক্ষণের এই প্রদোষালোকে সে পরবর্তী পদক্ষেপের পথ দেখাবে এই আশা নিয়ে বিশ্বের চলার পথের পদশব্দের দিকে আমি তাকিয়ে থাকব।

নরনারায়ণ আশ্রম
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
কালীঘাট, কলিকাতা।
আষাঢ়, ১৩৫৪।

রেণু মিত্র

যাঁর জীবন ও দর্শন নিত্য-অনিত্য, জড়-অজড়ের সংশ্লেষণের মধ্যে সমন্বয়ের চরমরূপ এঁকে দিয়েছে, যিনি নিশ্চিতরূপেই সর্বসমন্বয়মূর্তি, সেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের শ্রীচরণতলে "শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন" নিবেদন করে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বিষয় সূচী

শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন

সম্মুখপ্রধাবিত মনুষ্যজীবন যুগে যুগে নূতন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। জীবনের লক্ষণই এই। মনুষ্যজীবন-শতদলের এক একটি পাপড়ি খুলে যায় এক একটি নূতন হাওয়ায়, তারি গন্ধে ভোর হয়ে থাকে আকাশ বাতাস। আবার নূতন হাওয়া আসে কোন্ দক্ষিণের বাতাস বয়ে, আবার যায় পদ্মের পাপড়ি খুলে। এমনি করে ক্ষণে ক্ষণে সে এগিয়ে চলে। তাই মনীষী বললেন, "Reality lies ahead, not behind." —Bosanquet. এক একবার মনে হয়, পুরাতনই বুঝি আসে নূতন বেশ গায়ে জড়িয়ে; আসলে তার ভেতরটা একই। কিন্তু তা-ও তো নয়। একেবারেই সে নূতন নয়, তবু সে তো নূতনই। প্রকৃতির নূতন আবেষ্টনে পড়ে সে নূতন করেই দেখা দেয়, নূতন রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। পুরাতনের আবেষ্টনে যে সত্য ছিল প্রাচীন, নবীনের আবেষ্টনে সেই সত্যই আজ নবীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনকে সে প্রাচীনের মত করে সত্য করে নিজেও প্রাচীন সত্য হয়ে ছিল; আজ নবীনকে নবীনের মত করে সত্য করে সে-ই আবার নবীন

হয়ে বেরিয়ে এল। এমনি করে অনন্ত রূপ ধরে অনন্ত এক নবীন জীবন্ত সত্য ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করে চলেছে।

প্রতিক্ষণে নিত্য নবীন হয়ে চলার মধ্যেই এ জীবনের রসাস্বাদন। তাই কাল যা জানবার দরকার ছিল না, আজ তা অবশ্যজ্ঞাতব্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃতি হু হু করে ছুটে চলেছে, তারই মধ্যে মনুষ্যপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করছে। সে মনুষ্যপ্রকৃতি আত্মা-দেহমনধৃতিস্বভাবপ্রযত্নে জড়িয়ে বিধির আশ্চর্য অদ্ভুত সৃষ্টি। সেই মানুষ যখন সমাজের মধ্যে বাস করতে এল, আবেষ্টনকে জড়িয়ে সে তখন আরও আশ্চর্য হয়ে উঠল। দুদিকের সীমার মধ্যে বাস করেও সীমাকে সে তখন ছাড়িয়ে যেতে থাকে, তাইতে তার সৌন্দর্য এমন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে।

বাঁচাকে আস্বাদন করবার প্রয়োজনে মানুষ বিধান তৈরি করে। তারপরে একদিন তারই অন্তর বাহিরের প্রয়োজন সেই বিধানকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে আপনি এগিয়ে চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে একদিনের প্রয়োজনে যে বিধান স্বভাবতঃ তৈরি হয়ে উঠেছিল সে বিধানকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে এমনই শক্ত কাঠামোর মধ্যে নিজেই সে ফেলে দিয়েছে যে আজকের ভিন্নতর প্রয়োজনে তাকে আর ভিন্ন করে নিতে পারছে না। ছাড়াতে গিয়ে টান পড়ছে অন্তরে বাইরে, ডাইনে বাঁয়ে—রক্তাক্ত হয়ে উঠছে ব্যষ্টি সমষ্টির দেহমন। বিস্মিত পীড়িত মানুষ ভেবে পায় না কি হল। প্রয়োজনের স্বতঃস্ফূর্ত বিধান যা সেদিন রক্ষা করে এসেছে দেহমনকে, আজ তা এমন

লোহার শিকল হয়ে উঠল কি করে? মানুষের জড়ত্ব যখন এক বিধানকে ছাড়িয়ে নূতন আবেষ্টনের নূতন বিধানকে সময়মত গড়ে নিতে পারে না, তখন সেইখানে মানুষের জীবনের বড় ট্রাজেডি। বর্তমান জীবনচেতনাকে অস্বীকার করে একমাত্র অতীতের সাধনা ও সিদ্ধিকেই আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টার ফলে সে তখন না বর্তমানে, না অতীতে। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি—সকল ক্ষেত্রেই সে তখন ব্যর্থ শোষণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

এই নিজের হাতে গড়া বিধানের মধ্যে, একদিনের জীবন-দর্শন দিয়ে আর একদিনের জীবন পরিচালনা করতে যাওয়ার মধ্যে মানুষ যখন রক্তাক্ত হতে থাকে, অথচ তা ধরতে পারে না, তখন কারো কারোর চোখে তা ধরা পড়ে। আমাদের শরৎচন্দ্র সেই কারো কারোর একজন। তিনি তাঁর রচনায় মনুষ্যসত্তার এই নিপীড়নকে প্রকাশ করেছেন।

শরৎচন্দ্র লিখেছেন অনেকই। তিনি যেমন সেই সময়ের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষের দেহমনআত্মার অ-সামঞ্জস্য দেখেছিলেন, তেমনি মানুষের চিরন্তন সত্তার অস্তিত্বের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন। আমরা অনেকে তাঁকে অত্যন্ত বড় করে দেখি যিনি পীড়িত মানবাত্মার বেদনাকে প্রকাশ করলেন। অনেকে আবার তাঁকে অত্যন্ত অসুন্দর বলে মনে করি—তিনি ব্যষ্টি সমষ্টির জীবনের যত নোংড়াকে ঘাটিয়ে তুলেছেন। নোংড়া? যাকে নোংড়া বলছি তা সত্যই নোংড়া

কি? যদি হয় তো কেন সে নোংড়া হল? জীবনের মধ্যে সে কি চিরদিন নোংড়া হয়ে থাকবারই জন্যে সৃষ্ট হয়েছে? না আর কোন রূপের খবর তার স্বরূপের মধ্যে আছে? তথাকথিত বহু নোংড়া, বহু হেয় অবজ্ঞেয় অস্পৃশ্য বস্তু আজ আলোর মধ্যে তাদের যথার্থ পরিচয় দাবি করছে। এ দাবির কথা স্পষ্ট হল যখন তাদের কথা আমরা জানতে পেলাম।

শরৎচন্দ্র বলেছেন যারা সমাজের নীচের স্তরে পড়ে আছে তাদের উপর তাঁর সহানুভূতি বেশি—তাঁর বিরুদ্ধে অনেকের এ অভিযোগ সত্য। কেন এ সহানুভূতি—তা তিনি নিজেই লিখছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদেরই বেদনা দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।" দুর্ভাগ্যলাঞ্ছিত দুনিয়ার নরনারীকে শরৎচন্দ্র সত্যিই ভালবেসেছিলেন। মানবের বেদনাবিদগ্ধ বহু-বিচিত্র জীবনের গোপন রহস্যপুরে তাঁর সহানুভূতি-করুণ মমতাময় একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমন সদাজাগ্রত ছিল যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, "মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া

দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির হয়, তখন তাহার দোষ ত্রুটিতেও সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।” “নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধি-টুকু রেখে গেছে—ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে, সে তার সকল অপরাধের চেয়ে বড়।”—এই সব বঞ্চিত, দুর্বল, উৎপীড়িত “মানুষ”দের অনেক কথাই শরৎচন্দ্র আমাদের জানালেন।

বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষদের কথাই যে কেবল তিনি আমাদের জানিয়েছেন, তা-ই নয়। প্রতি মানুষের মধ্যে যে বঞ্চিত, উৎপীড়িত দ্বন্দ্বময় বৃত্তি, কথা, খোঁচা রয়েছে, সুন্দর প্রকাশের পথ না পেয়ে বিকৃতির যাদের আজ আর শেষ নেই, মানব-জীবনের সেই নিপীড়িত, নিষ্পেষিত খোঁচাগুলিরও অনেক কথাই আমাদের তিনি জানালেন।/

মানবচরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের সহজ অন্তর্দৃষ্টি এবং যে আঙ্গিকে তিনি তা চিত্রিত করলেন সে সকল সম্বন্ধে মিষ্টিমধুর তীব্রকটু আলোচনা সমালোচনা অনেক হয়েছে। এতদিনকার এত আলোচনা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে আলোচনার আরও অবসর রয়েছে। শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনা করেছেন সত্য কিন্তু সে সাহিত্যে তিনি কার কথা বলেছেন?

সাহিত্যধর্মের সকল বেড়া ডিঙ্গিয়েও যা প্রকাশ পেয়েছে, তা একেবারেই জীবনের কথা, সহজ মানুষের কথা,—মানুষের সৌন্দর্যের কথা, মানুষের অসৌন্দর্যের কথা, মানুষের অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা। এই সহজ মানুষের জীবনের সমগ্রতার দিক থেকে, বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিতেও তো বটেই, শরৎসাহিত্যকে দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমস্ত শরৎসাহিত্যকে বিচার করতে যাওয়া মস্ত কাজ। তাঁর লেখনী সারা জীবনে অনেকই রচনা করেছে। একদিকে উপন্যাস, ছোটগল্প যেমন অনেক, তেমনি এখানে ওখানে আলোচনা সমালোচনাও তাঁর মন্দ নেই। আর প্রত্যেকটিই দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে চমৎকার। তবু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র—সেইটেই তাঁর প্রধান ও প্রথম পরিচয়। উপন্যাস তিনি কয়টি রচনা করেছেন তার হিসেব রাখাও মস্ত ব্যাপার। এবং সেই অতগুলি উপন্যাসের মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্ কয়টি সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে উপযুক্ত, এ নিয়ে সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে নিশ্চয় বিতর্কের শেষ নেই।

সত্যিই, বিতর্কের সমাধান বড় সহজও নয়। কোন্ উপন্যাসটি সাহিত্যিক কোন্ আবহাওয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিশেষ দৃষ্টি দাবি করছে কিংবা কোন্ রচনাটি জীবনতত্ত্বের কোন্ গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল কিংবা কোন্ কাহিনী নিপীড়িতদের করুণ বেদনা প্রকাশ করে সবচেয়ে সাহিত্যধর্মী হয়ে উঠেছে—এ নিয়ে বিতর্ক চলবেই। চলবে যে তার কারণ

আছে। কোন্‌টা কোন্‌টার থেকে যে অধিক স্থান নেবে তার বিচারের মানদণ্ড কি? তাই আমরা জীবনের দিক থেকে বিচার করে বলব যে শরৎচন্দ্রের আর সব রচনা যদি কখনও লোপ পেয়েও যায়, কেবল তাঁর 'শেষপ্রশ্ন' বেঁচে থাকে, তবে ঐটে থেকেই শরৎচন্দ্রকে ঠিক চিনতে পারা যাবে, ঐটেই শরৎচন্দ্রের সমস্ত ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

জানি, এ সিদ্ধান্ত সমালোচনার সৃষ্টি করবে। 'শেষপ্রশ্ন' সত্যিকার রূপসৃষ্টি বা রসসৃষ্টি হয়েছিল কি না একদিন এ নিয়েই যথেষ্ট তর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন এ কথাটা কৃতী সমালোচকগণ বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে যত বিতর্কমূলকই হোক না কেন, এর মধ্যের সমস্ত তত্ত্ব নিয়েও 'শেষপ্রশ্ন' সত্যিকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কেননা এর সমস্ত তর্ক বা তত্ত্ব রসসৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং প্রত্যেকটি চরিত্র সেই তত্ত্বের মধ্য দিয়েই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একে সৎসাহিত্য বলে স্বীকার করতে আজ আর সে দ্বিধা নেই বটে কিন্তু এর যে স্থান এখানে নির্দেশ করা হয়েছে, তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি হয়তো মিলবে না। তবু বর্তমান মনুষ্য-জীবনচেতনায় বোধ হয় যা সব চেয়ে মুখ্য প্রশ্ন—মানুষের মধ্যের একের ও বহুর, ক্ষণের ও ক্ষণাতীতের আস্বাদনপ্রবণতার দ্বন্দ্ব—সেই দ্বন্দ্বের কথা এবং তার সমাধানের ইঙ্গিত উপস্থাপিত করে 'শেষপ্রশ্ন' যুগান্তরকারী রচনা, একথা না বলে আমাদের পক্ষে উপায় নেই।

আমরা আজ একটি একটি করে শরৎসাহিত্য আলোচনা করব না। আজ কেবল 'শেষ প্রশ্নে' মানুষকে—সামাজিক ও নৈতিক মানুষকে—কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, সেইটে দেখতে প্রয়াস পাব।

বইটির নাম 'শেষপ্রশ্ন'। বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের বর্তমানকালের এবং চিরন্তনকালের ব্যষ্টি এবং সমষ্টি সত্তা এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রশ্নে আকীর্ণ। মনে যদি করা হয় যে চিরদিনের শেষ প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, তবে ভুল করা হবে। কেউ কোনদিন সত্যকে শেষ করে জানতে পেরেছে এমন কথা আজকের বৈজ্ঞানিক মন স্বীকার করেই না—অতএব সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন-বহির্ভূত। "সত্যের সীমা কোন একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় নি।" আজকের দিনে আমরা এ কথাটিও জানতে পেরেছি যে সত্যের ধারণাটাই আবেষ্টনের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে প্রকাশ পায়। দেশকালের একান্ত বাইরে চিরন্তন সত্য বলে সত্যের কোন রূপ নেই। তাই আজকের দিনে সামনের দিকে যতটা দেখা যাচ্ছে, সেইখানে মানুষের ব্যষ্টিসমষ্টি সত্তার অনেক দুরূহ প্রশ্ন তিনি এই উপন্যাস-খানার মধ্য দিয়ে উত্থাপন করছেন।

কি কি প্রশ্ন কিভাবে তুলেছেন তা আমরা ক্রমে স্পষ্টতর করে বিবৃত করেছি। এইখানে এইটুকু বলা চলে

যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে সংকোচন বিধির 'নেতি'বাদের উপরে তার সভ্যতাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, দেখা যাচ্ছে কালের কীট তার মধ্যে প্রবেশ করে তাতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে, 'সমগ্রজীবনের' বাতায়ন থেকে তাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। অতএব জীবনের সামগ্রিক সত্তার এই যে আত্মপ্রকাশের জয়যাত্রা—এ কি সত্য ? না এ একেবারেই পরিত্যাজ্য ? তাই আজ প্রশ্ন উঠল ত্যাগ, সংযম, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, নিষ্ঠা প্রভৃতির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে ভাবে তাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সনাতন ভারতবর্ষ মেনে এসেছে আজও তা মানা যাবে কি না ? জীবনের দিকে তাকিয়ে বিচার করতে গেলে হয় বলতে হয় ওগুলি সত্য নয়, নয় বলতে হয় যে-অর্থে ওগুলি চলিত হয়ে এসেছে, সেই অর্থে ওগুলি আর আজকের দিনে চলবে না। বর্তমান কালের নূতনতর জীবনদর্শনেও ত্যাগ আছে, সংযম আছে, তপস্যা আছে, নিষ্ঠা আছে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা পূর্বেকার প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে বিভিন্ন। শরৎচন্দ্র তাই কয়েকটি জীবনপ্রবাহকে সম্মুখে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করছেন ঐ পূর্বের ত্যাগ, ভোগ সত্য কি না, স্বার্থপরতা সত্য কি না, বর্তমান সত্য কি না, বহু সত্য কি না। এতদিন জেনে এসেছি স্থিরতা সত্য, অচঞ্চলতা সত্য, আমাদের সনাতন অতীত সত্য, চেতন সত্য, সমষ্টি সত্য। আজ যুগধর্মে প্রশ্ন উঠল চঞ্চলতা সত্য কি না, জড় সত্য কি না, ক্ষণ সত্য

কি না, ব্যষ্টি সত্য কি না, বর্তমান সত্য কি না। আজকের দিনে এইটিই শেষ প্রশ্ন।

আজকের দিনে মানুষের প্রশ্ন কোন একদিকের নয়। আজকের মানুষকে জীবনের সমস্তগুলি দিক সম্বন্ধে ভাবতে হচ্ছে। আজ প্রত্যেক মানুষের প্রশ্নই জীবনের সমস্ত কিছুকে জড়িয়ে তাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে। কমবেশি সকল যুগেই মানুষের সব-কিছুর কথা মানুষকে ভাবতে হয়েছে। যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই একের জন্য অন্যের, আমার জন্য তোমার কথা যেমন ভাবতে হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের জন্য প্রেমের, প্রেমের জন্য রাষ্ট্রের অর্থাৎ মানুষের একদিকের জন্য আর একদিকের বিবেচনা করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে এসেছে। তবে কালের যাত্রায় আজ মানুষের প্রত্যেকটি দিক এবং ইতিহাসের সূত্র বেয়ে পূর্বের থেকে বহু বেশি দিক যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি তারা প্রত্যেকেই যথাস্থান পেতে চাইছে। আজ আর মানুষের প্রশ্ন কেবল রাষ্ট্রিক নয়, কেবল আধ্যাত্মিকও নয়, কেবল অর্থনৈতিকও নয়, কেবল সামাজিকও নয়, কেবল ব্যক্তিগতও নয়,—আজকের প্রশ্ন সবগুলির সমন্বিত ছন্দের। আজকের মানুষকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে হয়, তেমনি চলতে হয় তাকে সমাজের সঙ্গে—যদিও তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ওতে খোয়া যায় না, তার সার্থক প্রকাশ

পাওয়ার পথই শুধু খুলে যায়, যদি তুটোরই চলার তাল না কাটে। তেমনি আজকের মানুষকে রাষ্ট্রের কথা ভাবতে হয়, অর্থনীতিও বুঝতে হয় আবার সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-বোধের বাইরের অপ্রত্যক্ষকেও জানতে হয়। কেননা মানুষ যে বিরাট—সে তো স্বল্প নয়, সে তো হাল্কা নয়। স্বল্পের বোঝা যে বড্ড বেশি ভারী। 'যে নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়।' মানুষ তো স্বল্প নয়।

আজকের মানুষকে যে সমাজের কথা ভাবতে হয় সে সমাজ শুধু কোন গ্রাম বা কোন দেশেরই নয়। আজ একটি দেশের সমাজ আর একটি দেশের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করে—তা ছাড়া তার বাঁচবার উপায় নেই। আজ সকলে যেন একটিমাত্র সমাজকে স্বীকার করতে চাইছে—সে হচ্ছে 'মনুষ্য' সমাজ। অবশ্য দেশভেদে, সংস্কৃতি ও সংস্কারভেদে এ বিভিন্ন হয়ে যেতেই থাকবে—তবু সেই বিভিন্নতাটুকু স্বীকার করে নিয়েই যেন বলতে হয় যে আজকের মানুষ 'মানুষের' সমাজকে পেতে চাইছে। আত্মাদেহমনস্বভাব-প্রযত্নে জড়িয়ে প্রজ্ঞা ও প্রাণের সমন্বয়ে যে-মানুষ আত্মপ্রকাশ করলে, সেই মানুষের বহু সমাবেশে যে 'মনুষ্য সমাজ' গড়ে উঠল, আজকের দিনে মানুষ সেই মনুষ্য সমাজকে পেতে চাইছে। কেননা আজ মানুষের পরিচয়ই মানুষ হিসেবে—সে নর কি নারী, ধনিক কি শ্রমিক, সমাজের উচ্চস্তরের কিংবা

নিম্নস্তরের—সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। মানুষ যদি মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে না পারে, কী তার সার্থকতা, কী তার মহিমা? মানুষ নিজের হাতে স্বেচ্ছায় যতো ভেদাভেদের অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে দীর্ঘকাল পোষণ করে এসেছে, তারি বাসা ভাঙবার দিন এলো। দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে।

শেষপ্রশ্নের মধ্যে যে মানুষের কথা উঠেছে সে মানুষের পরিচয় দিতে হলে যে একটিমাত্র বিশেষণ তাকে প্রকাশ করবে সে হচ্ছে 'সহজ'। মানুষ যেখানে সহজ—সেখানেই তার মধ্যে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সম্মিলিত সুন্দর সামঞ্জস্য। যে-জীবনকে প্রাণের দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যা করা চলে আবার প্রজ্ঞার দৃষ্টিতেও, যেমন হৃদয়ের দৃষ্টিতে, তেমনি বুদ্ধির—সেই জীবনই হচ্ছে সহজ জীবন। এই যে প্রাণ ও প্রজ্ঞার বিভিন্ন দৃষ্টি—এরা যে আলাদা আলাদা ভাবেই অবস্থান করে, তা নয়। জীবনের এমন স্তরের খোঁজ মানুষ পেতে পারে যেখানে সে দুটো একত্রে মিলে যায়। অর্থাৎ মানুষ তখন বিশ্ববিধৃত সহজ জীবনপ্রবাহকে পায়। উপনিষৎ বলছেন, "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।" তখন দুটোকে বিভিন্নরূপে আর দেখা যায় না—জীবনের মধ্যে তারা ওতপ্রোত হয়ে মিলে যায়। এই অনন্ত চলায়মান বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিজের যথার্থভাবে প্রকাশ পেতে হলে মানুষকেও ছুটে চলতে হয়,

তাহলেই ছন্দ বজায় থাকে। স্বচ্ছন্দগতিময় প্রকৃতির চলার মধ্যেই মানুষের কাছে যে আস্বাদনটি কখনও পাওয়ায়, কখনও না-পাওয়ায়, কখনও প্রাণপ্রধানভাবে, কখনও প্রজ্ঞাপ্রধানভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেই আস্বাদনের ক্ষণ-গুলিকে নিয়েই জীবন। "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"—শেষের কবিতা। প্রাণের সদাচাঞ্চল্য আকস্মিকের সৃষ্টি করে চলে, ধারাবাহিকতা প্রজ্ঞার দান। এই যে ধারাবাহিকতা ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে প্রজ্ঞা ও প্রাণের মধ্য দিয়ে তাই সহজ জীবন। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ সত্তাকেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'শেষপ্রশ্নে' যথাক্রমে বুদ্ধি ও হৃদয় বলেছেন। শরৎচন্দ্র বলছেন, "...এ জীবনে সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয়, সত্যি শুধু তার চঞ্চলমুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই তো সত্যিকার পাওয়া।"

এই হল সহজ জীবনের পরিচয়, সহজ মানুষের পরিচয়। এই সহজ মানুষের দুটো ভাগ—নর ও নারী। "মানুষ তো শুধু নরও নয়, নারীও নয়—এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখন দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও

খোয়ায়।” “পৃথিবীতে কোন একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আরেকজনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়।” নর ও নারীর প্রত্যেককে অর্ধেক করে সৃষ্টি করে দু'য়ে মিলে এক হবার অবকাশ রেখে দিয়ে সৃষ্টিরহস্য বৈচিত্র্যময়। অন্তরে এরা এক, প্রকাশের ক্ষেত্রে দুই। “আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, বাহিরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে।” এই যে দু'য়ে মিলে এক এবং একের দুই—এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, সমাজের মধ্যে সর্বাঙ্গীন রূপে বাস করতে গিয়ে এই দু'য়ের স্থান কোথায় কেমন—শেষপ্রশ্নে সেই সব কথাই শরৎচন্দ্র তুলেছেন।

মানুষের এই দ্বিধাবিভাগকে যদি তাদের প্রত্যেকের যথার্থ স্বতন্ত্র মূল্যে স্বীকার করি, তবেই জটিলতার মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। দুটো সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণ বজায় রেখেও যে সমাজের মধ্যে মিলিত অবস্থা যাপন—এ বড় কঠিন। কেননা প্রজ্ঞাপ্রধান নর ও প্রাণ-প্রধান নারীর মধ্যের যে পারস্পরিক বিরুদ্ধতা তাকে সামাল দেওয়া সহজ হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নূতন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হোলো। এক জায়গায় এরা

পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল, সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা।”—শেষের কবিতা। এই বিরুদ্ধতাই আমাদের কাছে এতদিন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তাই তাদের মেলাতে পারিনি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ এবং আমাদের এই ভারতবর্ষ দুটো সত্তাকেই তাদের স্বাতন্ত্র্যে স্বীকার করতে শেখে নি। সে মানুষ বলতে কেবল নরকেই ধরে নিয়েছে প্রধান করে এবং তাকেই করেছে কেন্দ্র। তাই জীবনব্যবস্থায় নারীকে একান্ত ভাবে সেই নরের বিকাশ ও প্রকাশ লাভের সহায়করূপেই দেখে তার স্থান ও মর্যাদা নির্দেশ করেছে। নারীকে তাঁরা শুধু নারী করেই রেখেছিল, মানুষ হতে দেয় নি, তাইতে সে আজ এমন দায়, এমন ভার হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই নারী বন্ধন, তাই জীবনসাধনায় সে যেমন সঙ্গী নয়, ব্রহ্মলাভ-সাধনায় সে প্রতিবন্ধকই। তাই সে কেবল মোহিনী হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের কাছে এ দেনা আজ শোধ করবার দিন এলো। তাই আজ দেখা যাচ্ছে নারী শুধু চিরদিন সহায়কই থাকবে না, থাকতে পারে না। একটি পরিপূর্ণ মনুষ্যসত্তার এক প্রকাশ নর, অপর স্বাভাবিক প্রকাশ নারী। সেই মনুষ্যসত্তার পূর্ণ আত্মাস্বাদনের পথে বিশেষ ক্ষেত্রে নর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, নারী সেখানে সহায়ক রূপে নরের প্রকাশকে সম্ভব ও সুন্দর করে তুলেছে। আবার অপর বিশেষ ক্ষেত্রে নারীকে কেন্দ্র করে সেই মনুষ্যসত্তা বিকাশ পেতে চেয়েছে, নর সেখানে সহায়কমাত্র

থেকে নারীর বিকাশ ও প্রকাশকে সাহায্য করেছে। এই দুই অর্ধেকের স্বরূপ ও তাদের সম্বন্ধের জটিলতা নিয়েই শেষপ্রশ্ন রচিত হয়েছে।

নরনারীর সত্তা সম্বন্ধে যেমন, তেমনি আপাতপ্রতীয়মান পরস্পরবিরুদ্ধ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের পারস্পরিক বিরুদ্ধতার (antagonism) সঙ্গে তাদের পারস্পরিক পরিপূরকত্বকে (complementarity) একটি পূর্ণ সত্যের সত্য ও স্বতন্ত্র সত্তাময় দুটো পৃথক অথচ অভেদ সত্তা বলে স্বীকার করে নিতে পারি নি বলেই অত জটিলতার উদ্ভব হতে পেরেছে, অত প্রশ্নের অবতারণা হয়েছে। কোন একটিকে একমাত্র কেন্দ্র করার ফলে কালের যাত্রায় জীবনধর্মের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় অপরটি যখন তার প্রকাশ চাইল—অমনি লেগে গেল বিরোধ। সে বিরোধ আর মিটতে চায় না, বাক্‌বিতর্কবিতণ্ডার আর শেষ হতে চায় না, ঘুরে ঘুরে এক প্রশ্নই ফিরে ফিরে আসে। বাক্‌বিতণ্ডা কেমন করে শেষ হবে? প্রশ্নের মূলে প্রবেশ না করলে ও বাক্‌বিতণ্ডা অনন্ত-কালেও শেষ হবে না। তাইতে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের, ক্ষণকালের সত্যের সঙ্গে সনাতন সত্যের প্রশ্ন আর শেষ হতে চায় না। ওগুলিকে প্রথম থেকেই একান্ত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ বলে ধরে নিলে ত্যাগই সত্য না ভোগই সত্য, ক্ষণই সত্য না সাতত্যই (continuity) সত্য—কোনদিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

সেইজন্যেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে, তার ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য, সংযমকে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। যে অর্থে সনাতন ভারতবর্ষ ওদের দেখে এসেছে, তা যে প্রজ্ঞার ঐকদেশিক দৃষ্টির ফল, এ কথা ভুলে গিয়ে আমরা তাকেই সমগ্র সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম, তাইতে কিছুতে আর বিবাদের শেষ দেখা যাচ্ছিল না। আজ ভোগ, ত্যাগ, নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য, সংযম—এগুলির অর্থ আমাদের নূতন করে বুঝতে হবে ঐ সহজ জীবনের আলোকে। আজকের দিনের জড়, চেতন ও সেই সঙ্গে লজিকের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ওদের সম্বন্ধে এতদিনকার ধারণা আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। Re-valuation of life-values ছাড়া—জীবনকে নূতন করে ও সমগ্র করে দেখতে না পারলে বিবাদের নিষ্পত্তি আর কিছুতেই হবে না।

শরৎচন্দ্র কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রশ্ন যখনই উত্থাপন করেছেন, তখনই বুঝতে হবে প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিতটাও তাঁর মধ্যে ছিল, সচেতনতার ডিগ্রী তার যা-ই হোক না কেন। উত্তরের ইঙ্গিত যার বোধের মধ্যে আসে নি, প্রশ্নও তার মনে জাগতে পারে না। তাঁর চতুষ্পার্শের জগৎ ও জীবনকে দেখে দেখে শরৎচন্দ্রের বোধের মধ্যে কতকগুলি জিনিস বিশেষ সচেতনভাবে না হলেও ধরা পড়েছে। প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যা বেরিয়ে এল তা-ই উত্তরকে ইঙ্গিত করছে। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণ অখণ্ড সত্য খণ্ড খণ্ড ভাবে

আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই খণ্ড সত্যগুলি পরস্পর বিবদমান অথচ তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করছে। এই খণ্ড সত্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ এই জন্যই গজিয়ে উঠছে যে প্রত্যেকেই মনে করছে তার কথাটাই একমাত্র সত্য। অপর সত্যটিকে সে যেমন মুখ্যভাবে স্বীকার করতে চাইছে না, তেমনি সেইজন্যেই নিজের মধ্যে তাকে গ্রহণ করতেও পারছে না; অথচ তাকে বেমালুম অস্বীকার করবার উপায়ও খুঁজে পাচ্ছে না—কাহিনীর মধ্যে প্রশ্নটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করে রচনাকার এই ইঙ্গিতই রেখে গেছেন যে, এই খণ্ড সত্যগুলির প্রত্যেকটি এক একটি পূর্ণ সত্য হলেও তাদের প্রত্যেকের বাইরে সত্যের আর কোন রূপ নেই, একথা সত্য নয়। পরিপূর্ণ সত্য এই সবগুলিকে মিলিয়ে। শরৎচন্দ্র যখন জীবনের ও সমাজের অনাদৃত উপেক্ষিত দিকগুলিকে প্রকাশ করে তুলে তাদের অপরিহার্যতার কথা ঘোষণা করলেন, তখনই তার মধ্য দিয়ে তিনি নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিতও রেখে গেলেন।

মানুষ হিসেবে মানুষকে দেখতে চাওয়ার জন্য শরৎচন্দ্রকে লাঞ্ছনা অনেকই পেতে হয়েছিল। তিনি লিখছেন, "…যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র নাকি আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে—আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।" শরৎচন্দ্র এ অভিযোগের উত্তর দিয়ে বলছেন, "এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা

অকল্যাণ অধিক হয় কি না এ বিচারও করে দেখিনি, শুধু সেদিন যাকে সত্য বলে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি।"

মানুষের সত্তা কোথায় নিপীড়িত হচ্ছে, কেন নিপীড়িত হচ্ছে তা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তা-ই তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেন, "সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়তো আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ও কাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক—তাছাড়া আর কিছুই নয়।" সমাজ সংস্কারের দুরভিসন্ধি তাঁর ছিল না, থাকতে পারেও না। সেদিন যাকে জীবনের অপরিহার্য সত্য বলে অনুভব করেছিলেন, তাকেই শুধু প্রকাশ করে গেছেন। জীবনের রসধর্মের, প্রাণধর্মের স্বতন্ত্র মূল্যের স্বীকৃতির অপরিহার্যতার সত্যতা অনুভব করতে পারাই সে সময়ের সমস্যার সমাধানেরও ইঙ্গিত পাওয়া —অন্যথা সে সত্যতার উপলব্ধিই তাঁর থাকতো না।

সকল কাজ সকলের নয়, সকল কাজ সকল সময়েরও নয়। সেই দেশকালানুযায়ী তিনি যা প্রকাশ করে গেছেন, মানবাত্মার যে ক্রন্দনকে রূপ দিয়ে গেছেন, তা তাঁর দেশকালের উপযোগীই হয়েছে। সমাজ সংস্কারের পূর্বে সমাজের গ্লানিকে লোক সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হবে, সমাজকে সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, সংস্কারের ব্যাপার আসবে তারই পরে। তাই

শরৎচন্দ্রের পক্ষে সমাজ সংস্কারের দুরভিসন্ধি থাকা বাস্তব নয়ই। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখে তার জীবনের অপরিহার্য দিকগুলি সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন হতে পেরেছিলেন, সেইখানেই তিনি মনুষ্যজীবনের দুঃখবেদনার সমাধানের ইঙ্গিতও পেয়েছিলেন। সমাধানের ইঙ্গিত, যত স্বল্পই তা হোক্ না কেন, পেয়েছিলেন বলেই প্রশ্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তা না হলে ঐ প্রশ্ন তাঁর মনে উদয়ই হতো না, যেমন হয় না অনেকেরই।

এখন বইর মূল কাহিনীতে প্রবেশ করে আমরা দেখব আমাদের ঐ সব প্রশ্ন কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের সম্বন্ধে আমাদের বলবার কি আছে।
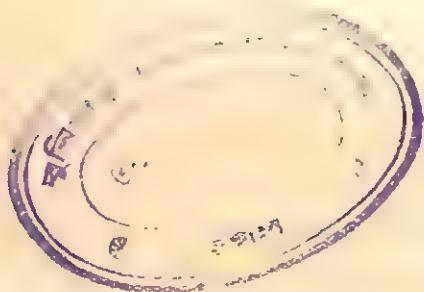
শেষের দিনের শেষ বৈঠক। আশুবাবু, কমল ও হরেন্দ্র উপস্থিত। এমন সময় এল অজিত। জানালে ওরা আজ ভোরেই চলে যাচ্ছে। ঐখান থেকে ওদের যাত্রা হবে সুরু। শুনে সকলেই লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলেন। নিঃশব্দে নীলিমা এসে বসল। আশুবাবু বললেন—"হয়তো আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হতো আমি দেখে যেতে পেতাম।"

"অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ জিনিস আমি চাই নি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বারবার বলেচি, বারবার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ—যা কিছু আমার আছে,—সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয় নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব সমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ

সে আপনাকে নিঃস্বত্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এত টুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে তো আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা'হলে সেইটেই হবে তোমার সব চেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিচ্ছিদ্র করে বাড়ী গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরী হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না। কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল? কই সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুইচক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই কমল। ঐ একই কথা মা। এই আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, "সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার মান বেশি।"

—অজিত বাঁধতে চায়, বাঁধা পড়তে চায়। কেবল অন্তরের বাঁধনবিহীন অকারণ বন্ধন নয়; তাদের বন্ধনকে অটুট করবার জন্যে বাইরের অনুষ্ঠান দিয়ে তাতে এমন শক্ত গেরো আঁটতে চায় যে, কোনদিন কোন 'কিন্তুর দিন' যদি আসে, কোন ভয়ের কারণ যদি ঘটে, তাহলে যেন সে বন্ধন অটুট থাকে। নিজের বলতে তার আর কিছুই ছিল না কেবল বাবার দেওয়া টাকা ছাড়া। শক্তিমান বলে কমলের কাছে সে কোনদিন অভিমানও করেনি। ঐ টাকা, ঐ তার সম্পদ—সেই সব দিয়ে সে কমলকে বাঁধতে চায়, নিজেও বাঁধা পড়তে চায়, কিছুই হাতে না রেখে। কমলকে সে ভালবেসেছে বটে, কিন্তু কমল যা বলে বা কমলের যা জীবনপ্রবাহ তার সাথে অজিতের কোন সহজ পরিচয় নেই। কমলের কাছে সে শুনেছে যে, নিরেট নিচ্ছিদ্র করে বাড়ী গাঁথতে চাইলে তাতে মড়ার কবরই তৈরী হয়, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হয় না। কিন্তু এর কোন অর্থ তার হৃদয়ঙ্গম

হয় নি। যা দিয়ে জীবনকে সে পরিমাপ করে সে হচ্ছে সচেতন বুদ্ধির হিসেব। সে উপলব্ধি করে যে, কমলকে সারা জীবন বেঁধে রাখবার মত জীবনের সচল সমগ্রতা তার নেই।

আজ যাকে ভালবেসেছে, চিরদিন তাকে ভাল না বাসতে পারে, একথা মনে করে বুদ্ধিমান মানুষের অন্তর যখন পীড়িত হয় তখন সে চিরদিনের জন্য কি দিয়ে ব্যবস্থা করতে চায়?—তার কাছে বাইরের দড়ির শক্ত গেরোই মস্ত বড় ভরসা। চলনধর্মী জীবনের সচলতার এ হিসেবের খবর সে রাখে না যে, শক্ত গেরোরও মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়, ফাঁটল ধরে এবং তারই মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্বন্ধ কখন গলে পড়ে যায়। অজিতের বুদ্ধিমান মন একথা বুঝতে পারে নি যে, হয়তো একমাত্র অকুণ্ঠ নিঃসংকোচ ভালবাসার পূর্ণ আত্মনিরসনের পথেই প্রাণপূর্ণ কমলকে সে বেঁধে রাখতে পারতো। পরাপেক্ষা না করার মত মনের একটা স্বাধীন অবস্থা যে কমলের আছে, কমলকে বেঁধে রাখবার পক্ষে অজিতের সে-ও ছিল একটা সম্বল, যদি সে সম্বন্ধে অজিত সচেতন থাকতো এবং নিজেও তেমনি স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন হতো। যাওয়ার দিন কার দিক থেকে প্রধান হয়ে উঠবে তা সে জানে না, কিন্তু কমলের সমস্ত জীবন-চেতনার সঙ্গে যে তার সচেতনযোগ অত্যন্ত অল্প, এ সে ভাল করেই জানে। তাই তার যেমন ভয়, তেমনি বেদনা।

কোন দিনের কোন "কিন্তুর দিন"কে অজিত যে একেবারে ঠেকাতে চায়, তার কারণ নরনারীর সম্বন্ধের মধ্যেও যে একটি পারমার্থিক সত্য আছে স্থিতিধর্মী অজিত তা জানে না। কমলকে কিছুদিন আগে সে বলেছে যে, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই যে পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ, বুদ্ধির দিক দিয়ে এ সে বিশ্বাস করে এবং কেবল বিশ্বাস নয়— এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর আর কিছু নেই৹ এ বিষয়েও সে নিঃসংশয়। তবু অজিতের পক্ষেই "সমস্ত জীবনে ভালোবাসার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে।"

অজিত জীবনটাকে তার সমগ্ররূপে দেখতে জানে নি। প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যে বর্ধিত অজিত জীবনে কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগরূপ তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য বা সংযম এবং জীবনকে রসে সঞ্জীবিত করে' তার চলার আনন্দকে প্রতি চঞ্চলতার মধ্যে, সমস্ত অনিত্যতার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে যে-ভালবাসার তপস্যা—এই দুটোকে একেবারে পৃথক ও বিপরীত করে দেখেছে। এই দুইয়ের মধ্যে সে কোন সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও সমন্বয় দেখতে পায় নি। সে জেনে ও বুঝে এসেছে যে, এর যে কোন একটিকে নিলে অপরটিকে ত্যাগই করতে হয়। এবং যেহেতু কামিনীকাঞ্চনত্যাগই তার কাছে সত্য, সেই জন্যে প্রাণের কম্পনময় আবেগ তার কাছে একেবারে মিথ্যে ও বিভ্রান্তকারী হয়ে আছে। সেই জন্যেই তো সে অত

দুর্বল। আর সেই জন্যেই কমলকে সে বুঝে উঠতে পারে না। তবু প্রাণধর্মের স্বাভাবিক সজীবতাটুকু তো কারো মধ্য থেকেই কোন দিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং বুদ্ধির মধ্য দিয়ে যাকে অস্বীকার করা হয়, প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণায় তা আরও জোরাল হয়ে দাঁড়ায়। তাই অজিতের মধ্যে ভালবাসার যে প্রবণতা ছিল তারই জন্য কমলকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু একান্ত প্রাণধর্মী কমলকে বেঁধে রাখবার মত জোর নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। সহজ জীবনের মধ্যে যেখানে মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয় কোনটাই কোনটাকে অভিভব করবার সচেতন ও অচেতন কোন অভিসন্ধি না রেখে মিলে গেছে, সেই সহজ জীবনের মধ্যে যে বাইরের কোন বাঁধনকে পাকাপোক্ত না করেও মানুষকে সর্বকালের মত বেঁধে রাখা যায়—অজিত জীবনের সেই স্তরের খোঁজ পায় নি। তাই ভয়ের তার অন্ত নেই। তাইতে সনাতনী অজিত ভাবছে বিবাহের বন্ধনে আটকাতে পারলেই বোধ হয় কমলকে সে রাখতে পারবে।

এইখানে আরও একটি কারণ আছে। নারীর আর্থিক দুঃখ পুরুষ জাতহিসেবেই সাধারণতঃ সহ্য করতে পারে না। সে মনে করে যে, জীবনের ভরণ-পোষণ বা আর্থিক দিকটিকে দেখা বা সেটার থেকে নারীকে রক্ষা করবার ভার একমাত্র পুরুষেরই। অজিতের মধ্যে এই ভাবটি ছিল খুব স্পষ্ট।

তাই একদিন যদি তাদের আবার পৃথক হতে হয় তবে সে-দিনের কমলের আর্থিক দৈন্যের কথা মনে করে তার অন্তরাত্মা শিউরে উঠতো। যে দিন মিটিংএ কমলের উপর নানা বক্রোক্তি কটূক্তিতে যোগ দিতে অজিতের সচেতন মনে একটুও বাধে নি, সেই দিনই মিটিং ফিরতি হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে আশুবাবু যখন কয়েকটি টাকার জন্যে জামিন হতে না চেয়ে কমলের লোকটিকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন অজিতের মনে হল "অক্ষয়ের বর্বরতায় যত৽শূলই থাক, এইমাত্র আশুবাবু যাহা করিলেন তাহাতে যেন কমলের কান মলিয়া দেওয়া হইল। অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া।...দুর্দশাপন্ন ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়টি টাকা ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যেন সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল।"

এর পর যখন কমল কুলি-মজুরের জামা সেলাই করে দিন চালায়, তখনও কমলের আথিক দৈন্য অজিতকে পীড়িত করেছে। এরও পরে কমলের সঙ্গে অজিতের পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কমলের প্রতি তার বিদ্বেষ যখন প্রশমিত হয়ে এসেছে, তখন একদিন অজিত ও কমলে কথা হচ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে কমল এক সময়ে বললে, যাদের স্পষ্ট করবার লোভ বেশি তারা ভালবাসলে যে কি করে, তা সে জানে না। উত্তরে অজিত বলছে, সে জানে। "তারা শৈব বিবাহের ফন্দি আঁটে না, স্পষ্ট পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্তমানে অন্যের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্য বাড়ীওয়ালার

শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না" লাগে তাই দেখে। এতে বোঝা যায় তার প্রীতির আস্পদ কোনদিন আর্থিক দুর্ভোগ না পায়, বিবাহসম্বন্ধে অত উদগ্রীব হওয়ার মূলে অজিতের মধ্যে এ ভাবটিও কাজ করছিল।

এটাই আর একটু চরমে উঠে যখন একান্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন পুরুষ নারীকে তার প্রীতির সঙ্গী ও পথচলার বন্ধুজন এবং সেই হিসেবে রক্ষণীয় মনে না করে নিজেকে তার প্রভু ও কর্তা করে তোলে, আর তখনই পারস্পরিক রক্ষণাবেক্ষণের স্নিগ্ধ মাধুর্য হারিয়ে গিয়ে তার কদর্য রূপটি ফুটে ওঠে। অজিতের মধ্যে প্রিয়জনকে আর্থিক দুঃখ থেকে বাঁচাবার ইচ্ছার পশ্চাতে আর্থিক ব্যবস্থাসম্বন্ধে পুরুষের এক-কর্তৃত্ব-বোধের একটা খোঁচাও যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

তাই অজিত যখন কমলকে সকল সম্পত্তি দিয়ে বাঁধতে চাইল, তখন তার পেছনে প্রধানভাবে কাজ করে অজিতের বুদ্ধিপ্রধান সংস্কারই, যে সংস্কারে নরকে কেন্দ্র করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বুদ্ধি বস্তুটি স্থিতিধর্মী, তাই আপন জনকে চিরদিনের মত আপন করে রাখার কথাটা তার কাছে মস্ত বড় হয়ে ওঠে এবং সে পথে যাকে সে একমাত্র সহায় মনে করে সে হচ্ছে বাইরের ঐ নানা প্রয়োজন, নানা হেতু, নানা আচার-আচরণের দৃঢ় বন্ধন। সে জানে না এটা বুদ্ধিরই কৌশল, জীবনের নয়। কেবল বুদ্ধির কৌশলে বাঁধতে গেলে জীবনের অপর বিশেষ দিক হৃদয়ও যে বাঁধা পড়বে, তা মোটেই নিঃসন্দেহে বলা চলে

না। তাই একটি সমগ্র জীবনের সঙ্গে একটি সমগ্র জীবনের বন্ধন হলে ভাবনার অত কারণ থাকে না, অন্ততঃ বাদ দেওয়ার ভুল থেকে নিষ্কৃতি মেলে—দুঃখ যতই থাক। কিন্তু এত সব অজিতের বুঝবার কথা নয়। তাই আপন জনকে আপন করে রাখার যে চিরাচরিত কৌশল সে জানে, তাই দিয়ে অচ্ছেদ্য দৃঢ় গ্রন্থিতে কমলকে সে বাঁধতে চাইলে।

কিন্তু অজিতের প্রস্তাবে কমল কিছুতে স্বীকৃত হয় নি। সে জানে যে, যে ঐকান্তিক হৃদয়ধর্মকে তার সমস্ত সত্তার মধ্যে সে স্বতঃস্ফূর্ত করে তুলেছে অজিতের পক্ষে তা একেবারেই নূতন কথা। তাই আশুবাবু যখন বলেছিলেন কমলকে "অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে অজিতকে হয়তো তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষা করো মা, আজ থেকে সে ভার তোমার," তখন তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন। অজিতের সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপ-আলোচনার সময় থেকে সহজ প্রাণদর্শনের যত কথা অজিতকে সে বলে এসেছে, অজিতের পক্ষে তা সহজ হয়ে ওঠে নি, কেবল কমলের প্রতি তার বিদ্বেষ পিছনে সরে গিয়ে প্রীতি সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছে।

অজিত একথা বুঝতে পারে না যে, মানুষের জীবন বস্তুটি নমনধর্মশীল, ছিদ্রবিহীন ফাঁকহীন শক্ত করে কোন একটি বিশেষের মধ্যে তাকে চিরদিনের জন্য গেঁথে ফেলা

যায়ই না, তাতে মানুষের জীবন্ত ভাব আর থাকে না। সে বোঝে না যে, জীবনের পক্ষে বুদ্ধি বস্তুটি ও তার ছককাটা পথ সবটুকু কথা তো নয়ই, বরং মানুষের চলার পক্ষে অবচেতন মনের ঐ যে প্রাণস্তর বা হৃদয়, তা-ই অনেক বড় কথা। এবং সেই প্রাণস্তর বা হৃদয়ের ধর্ম হচ্ছে সে চঞ্চল, সে নূতনের, নবীনের আকাঙ্ক্ষী, চপলতার চটুল ছন্দে তার নৃত্যপরা গতি,— যার সহজ ছন্দটি ধরতে না পারলে সে মানুষকে যুগে যুগে তার সকল বিচার বিবেচনা, বুদ্ধির সকল ছককাটা বাঁধাপথের থেকে ছিটকিয়ে নিয়ে যায় অজানা অচেনা ভয়-বিক্ষুব্ধ জটিল দুর্গহনে, ধ্বংসের প্রলয়লোকে। সে জানে না "এই হৃদয় বস্তুটি লোহার তৈরী নয়। একান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়—কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য।" অজিত খবর রাখে না যে, মানুষ যখন চলে, কাজ করে, তখন সে সচেতন বুদ্ধির হিসেব মনে রেখে গুণে গুণে তারই বাঁধাপথে পা চালায় না। সে চলে তার চেতন অবচেতন ব্যক্তিসত্তার সাকুল্যে, অনেকখানিই যা থাকে অবচেতন স্তরের গহ্বরে। আর চলে মানুষ অভ্যস্ত আচার-অনুষ্ঠান-নিয়মের চক্রপথে। অথচ বিচার যখন করতে বসে, তখন কাণ্ডারী করে কেবল বুদ্ধিকেই—তাই কিছুতে আর থই পায় না। প্রকৃতির এই পরিহাস লক্ষ্য করে অলক্ষ্যে মানুষের বিধাতা তখন বেদনায় হেসে ওঠেন।

অজিত চায় স্থায়িত্ব এবং সে স্থায়িত্বও একান্ত বুদ্ধিপ্রসূত।

চঞ্চল প্রাণ ও স্থায়িত্বধর্মী বুদ্ধির সমবায়েও একপ্রকার স্থায়িত্ব আছে, যার রূপ, যার চলন বুদ্ধির স্থায়িত্ব থেকে আলাদা অথচ জীবনের পক্ষে তা অপরিহার্য। সে স্থায়িত্বের খোঁজ যেমন অজিতের জানা নেই একেবারেই, আবার কমলও তাকে জানতে পায় নি, তা হলে তার চলন, তার পথও অন্য রকম হতো।

চিরদিনের দাসখৎ লিখে যে বন্ধন নেবে না, তাকে বিশ্বাস করবে অজিত কী দিয়ে? "উঠোনের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন একবেলার বেশি নয়। তার চেয়ে ওই মসলাপেশা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের চিরস্থায়ী।" ওই মশলাপেশা নোড়ার স্থায়িত্ব ওদের সত্যাসত্য যাচাই করবার মানদণ্ড। শিবনাথের প্রতি শিবাণীর ভালবাসা অজিত নিজের চোখেই দেখেছে। একদিন যেন তার সীমা ছিল না কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অজিতের মতে, "মনে হয় নারী জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।" এর উত্তরে একটু পরে কমল বলছে, "সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন ছুনিয়ায় কম পুরুষের ভাগ্যেই তা জোটে, কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে, মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক ততবড়ই সত্যি।"

অজিতের ঐ কথাটি থেকে ছুটো জিনিষ ধরা

পড়ছে—এক হচ্ছে, একদিন যা ছিল, আর একদিনও তা-ই থাকবে, সেই প্রচলিত স্থায়িত্ববোধ। কাল যাকে ভাল বেসেছিলাম, আজ তাকে ভাল না বাসা—এ ঘটতে পারে কি করে। দ্বিতীয় হচ্ছে, পুরুষের ও নারীর জীবনদর্শন এক নয়। কেবল আবেষ্টনগত ভেদেই যে তার পার্থক্য, তাই নয়—মূলেতেই ও পৃথক। ঐ বদলে যাওয়া নারীর পক্ষে একেবারেই সম্ভব কি করে? অজিতের এই প্রশ্ন করার মূলে রয়েছে সেই একত্ববাদী সনাতনী ভারতবর্ষের ভাবনার ধারা—যা আপাতবোধ্য একান্ত বুদ্ধির ন্যায়শাস্ত্রের জোরে জীবনের জটিলতাকে বাদ দিয়ে তাকে সোজা পথে চালনা করবার পথনির্দ্দেশকে মেনে নিয়েছিল। তারই প্রতি-ক্রিয়ায় প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণতিতেই আজ কমলের উদ্ভব। সেই প্রতিক্রিয়ায় জীবনের অবচেতন স্তরের প্রাণের দাবি যখন তার শতধাবিস্তৃত বহু বাহু বিস্তার করতে চায়, তখন প্রাণপণে ঐ বুদ্ধির হিসেব তাকে অস্বীকার করতে থাকে, সব সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনায় দুই হাতে মাথা চাপড়ে কেঁদেও আর পথ পায় না। মনে করে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সব শূন্য।

এতদিনের পথের ছক ভারতবর্ষের রক্তের মধ্যে এমনই দৃঢ় শিকড় গেড়ে বসেছে যে, সে আজ বেমালুম ভুলে গেছে যে "সুদীর্ঘ সংসারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্য দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি—সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক।" প্রশ্নের অপর দিকও যে আছে, তা অচলায়তন ভারতবর্ষ ভুলে খেয়ে

বসেছিল। কিন্তু যুগধর্মে আজ আর অখণ্ড জীবনের প্রশ্নের অপর দিককে চাপা দেওয়া যাচ্ছে না, যাবে না। মানবাত্মার যা করুণ কাহিনী, সনাতনী সমাজের দৃষ্টিতে তা-ই তার গ্লানি। এদের দৃষ্টিতে যা গ্লানি, সমগ্রের স্তরে তা মানবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তাময় সত্য স্পন্দন। এই স্বাভাবিক অপর দিকটি দীর্ঘদিন নিগৃহীত, নিপীড়িত হয়ে আজ দিকে দিকে বিকৃত রূপে, বিকৃত ছন্দে আত্মপ্রকাশ করছে। তবু এই সব বিকৃতি বিরূপের ছন্দহীনতার এলো-মেলোর মধ্য দিয়ে এই দুই দিক মিলিয়ে, দুইদিকের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে একটি সমন্বিত ঐক্য, একটি সংশ্লেষণ প্রকাশ পেতে চাইছে।

একান্ত বুদ্ধির লজিক দিয়ে ভারতবর্ষ জগৎ ও জীবনটাকে সরল রেখা বলেই ধরে নিয়েছিল। এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই সরল রেখার ঐক্য জীবনে আনবার প্রয়াসে সে সেই মত ধ্যান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সংযম গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে জগৎটা ও জীবনটা ইউক্লিডের সরল রেখা নয়। আঁকা বাঁকা চোখা নানান কোণ নিয়ে সে একটি বিচিত্র আনত বক্র পদার্থ (Curve)। তবু সেই বক্র বস্তুটিরও একটি সমন্বয়ের ছন্দ, একটি ঐক্য আছে। বর্তমান জগৎ এই ঐক্য খুঁজছে। বুদ্ধিকেন্দ্রিক প্রজ্ঞাবাদ হৃদয় বা প্রাণকে তার একান্ত বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছিল, কেননা প্রাণকে, প্রাণের অবচেতন স্তরের জটিল কুটিলতার

বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তার ছন্দ দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। বুদ্ধি তার মত করে জড়চেতনের একান্ত ভেদের উপর ইমারত গড়ে নিয়ে ক্রমসমুচ্চয়ের সিঁড়িপথে জীবনের সমস্যার সমাধান করলে। কিন্তু যাকে সে বাদ দিলে সেই Satan প্রাণ লুকিয়ে থেকেও চক্রান্ত করতে ছাড়েনি—কেননা প্রকাশ পাওয়া তারও ধর্ম।

"প্রশ্নের দুটো দিকই আত্মপ্রকাশ করল বলেই তো প্রশ্ন আজ জটিল হয়েছে। এই দুটো দিক—এই বুদ্ধি ও হৃদয়ের, এক ও বহুর, বর্তমান ও সনাতনের—পরস্পরবিরুদ্ধতা ও পরস্পরপরিপূরকতা মিলেমিশে যে তৃতীয় অবস্থা বা সহজ জীবনের সহজ প্রবাহের সৃষ্টি করে, মানুষ আজ সেই সহজ জীবনের সহজ প্রবাহকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে পেতে চাইছে। কিন্তু ধরতে পারছে কই? যাকে প্রথম থেকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি, তাকে আজ পেতে হলে আবার মূলের থেকে রওনা হওয়ার জন্য তাকে নূতন করে ভেঙ্গে গড়তে হবে, পুরাতন পাত্রে নূতন মদ পরিবেশন আর চলবে না। আরম্ভেই দুটোকে মিলিয়ে না নিলে পথিমধ্যে আর তাদের মেলান যাবে না।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিগত দিনের দর্শন দিয়ে বর্তমানকে সমর্থন করার চেষ্টা হয়েছে, আজও সে চেষ্টা নানা দিকেই চলছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই একথা স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠছে যে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি কোনটাকেই

আজ আর অতীতের মত করেই চালান যাবে না। যে অনন্ত বাস্তব প্রতিদিন আত্মপ্রকাশ করছে, করবে, জীবন্ত ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতির ব্যবস্থায় সেই বাস্তবকে স্বীকার করে নিতেই হবে। আর ওরা তো কোনটাই কোনটা থেকে পৃথক বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, জীবনেরই ওরা বিভিন্ন প্রকাশ, তাই জীবনধর্মের যা মূল সূত্র, সেই মূলসূত্রেই ওদের সকলকেই চলতে হবে। বিশ্বের চেতন অচেতন সত্তা সম্বন্ধে—এক কথায় বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বে আজ যে নূতন দর্শনের হাওয়া এসে গেছে, তারই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয়কে তার তার যথাস্থানে স্বীকার করে তাদের যে সম্মিলিত আত্মপ্রকাশ, তাই দিয়ে চালাতে হবে বর্তমানকালের বর্তমান জগতের জীবনপ্রবাহকে। এজন্য ঢেলে সাজতে হবে আমাদের সব কিছুকে।

ভারতের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের যে চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়ায় আজ তার উল্টো দিকটি আত্মপ্রকাশ করেছে বলে বলেছি, সেটা হচ্ছে ভারতীয় প্রচলিত সনাতন প্রজ্ঞাবাদী চিন্তাধারা, আমরা রক্তের মধ্য দিয়ে যেটা পেয়েছি। ভারতের ধর্মসমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এ যখন প্রবেশ করলে তখন এক দিক দিয়ে এ যেমন তাকে দিলে স্থায়িত্ব, তেমনি সেই স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে দিয়ে সামনের পথকে সে দিলে রুদ্ধ করে। এটাকেই বোধ হয় ভারতবর্ষের দার্শনিক যুগ বলা যায়। সেদিনকার প্রয়োজনেই নিশ্চয় সে উদ্ভূত হয়েছিল, এবং তার যুগধর্মকে নিশ্চয় সার্থকও করেছিল। কিন্তু আজ সে তার

রূপে একেবারে পরিত্যাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়েই তথাকথিত সনাতন মায়াবাদ শিকড় গেড়ে বসল। তারপর থেকে এর উল্‌টো দিকের যতরকম কথা ভারতবর্ষের জীবন-ধারায় প্রবেশ করতে চেয়েছে, তাকে দৃঢ়ভাবে ঠেকান হয়েছে। এই প্রচলিত সনাতন চিন্তাধারা আমাদের শিখিয়েছে যে খণ্ডের মধ্যে, ক্ষণের মধ্যে অখণ্ড, ক্ষণাতীত নেই; আছে খণ্ডের বাইরে। খণ্ড, ক্ষণ বহু, তাই সে মিথ্যা; তার বাইরে যে অখণ্ড, ক্ষণাতীত আছে, তা-ই সত্য। অতএব বহুর লীলাবিলাসস্থল এই জগৎ সত্য নয়; নিত্য সত্যকে পেতে হলে এর বাইরে যেতেই হবে। তাইতেই এই জগতটা হয়ে গিয়েছিল আমাদের কাছে নেহাৎ বাজে, কেবল থাকতে হচ্ছে বলেই থাকার স্থান, এখান থেকে যেতে পারলেই পরম লাভ।

তাই এর উল্‌টো দিকের যে কথাগুলি সেই বুদ্ধদেবের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের সময় থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, কেউ তারা বিশেষ আসন পায় নি। কিন্তু ইতিহাস বয়ে চলেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে ঠেকান গেল না। জড়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল; কেবল প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিক্রিয়ায় আজ বেশি মূল্য আদায় করে নিচ্ছে। আজ তাই বলবার দিন এসেছে যে ক্ষণের মধ্যে, খণ্ডের মধ্যেই ক্ষণাতীত, অখণ্ড আছে, যেমন আছে প্রতি ক্ষণের, প্রতি খণ্ডের বাইরেও। তাহলেই ক্ষণের,

খণ্ডের স্বয়ংমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এই স্বয়ং-মর্যাদাপূর্ণ অখণ্ড খণ্ডগুলি, ক্ষণাতীত ক্ষণগুলির সমবায়ে গড়ে ওঠে আর একটি অখণ্ড। এই কথাটিই বুঝতে পারলে আধুনিক চিন্তাজগতের দ্বন্দ্ব মিটবে। খণ্ড ও ক্ষণ বলে যা বোঝাতে চেয়েছি, তার মধ্যেই এসে যায় চঞ্চলতা, বহু ইত্যাদি—যা আমরা অন্যত্র বলেছি। জীবনে ক্ষণ ও সাতত্য, অতীত ও বর্তমান, স্থিরতা ও চঞ্চলতা, এক ও বহু যে পরস্পর বিরুদ্ধই শুধু নয়, ওদের কোন একটির অস্বীকৃতি বা অভি-ভবের উপরে যে ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থ কোন নীতিই, সত্য ও দৃঢ় নির্ভরতা লাভ করতে পারে না—এ তত্ত্ব বুঝবার ও আয়ত্ত করবার আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

তাই অজিতের "মনে হয় নারী জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই," আর কমলের "সেদিনের থাকাটা যেমন সত্য আজকের না থাকাটাও ততবড়ই সত্য"—এই দুই মন্তব্যের জবাব পেতে হলে আমাদের বর্তমানকালের এই নূতন জীবনদর্শনকে স্বীকার করতে হবে। বুদ্ধিপ্রধান পুরুষ-তন্ত্র সত্য ও সমাজকে স্বীকার করে বলেই অজিত বলতে পেরেছে নারীজীবনে এ একেবারেই মিথ্যা। সে বললে না যে মানুষেরই জীবনে এ মিথ্যা। পুরুষের নারীকে আজ ভালবাসা, কিংবা কাল মিথ্যে হয়ে যাওয়া, এ হতে পারে, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু নারীর পক্ষে এ একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আজ পুরুষের পক্ষে যা সত্য, আবেষ্টনানুযায়ী নারীর পক্ষেও তা

সত্য। কেবল তা-ই নয়; কমল বলছে একদিন যা ছিল আর একদিন তা-ই থাকবে না—এটাও সত্য। কি করে তা পরে দেখতে পাচ্ছি।

অজিত বুদ্ধির স্থায়িত্ব বোঝে, সে প্রথমের সঙ্গে শেষের সম জাতীয় ঐক্য ও সাতত্য চায়। প্রথমদিন অজিতের সঙ্গে মোটরে বেড়িয়ে ফিরবার মুখে কমল বললে, "আজ আমার কি ভালই যে লেগেছে তা বলতে পারি নে।" অজিত বলছে, "ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দও তো অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে?" কমল, "নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকলেও এ প্রমাণ হয় না যে-আনন্দ আজ পেলাম তা পাই নি।" অজিত, "…শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয়, তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক, তাকে সত্যিকার আনন্দভোগ বলা চলে না। এ তো আপনি নিশ্চয় মানেন?" কমল, "না মানিনে। আমি মানি যখন যেটুকু পাই, তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত সুখের শিশির বিন্দুগুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। …একদিনের আনন্দ যেন না আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে।" কিন্তু অজিত এ সকল কিছু বুঝতে পারে নি।

এর পর ক্ষণিকের মোহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কমল বলছে, "…হোক্ মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও তো মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের সত্য নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতী

ফুলের আয়ু সূর্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে ?...আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এতবড় সত্য ?" এ কথাও যে অজিত বোঝে নি, তা কমলও জানতো। আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, কমল তাদের কেউ নয়—সে বলেছে।

অজিত বলছে, "এ আনন্দের (ক্ষণকালের আনন্দের) যে কোন স্থায়িত্ব নেই।

না-ই বা থাক। কিন্তু গাছের ফুল শুকোবে বলে সুদীর্ঘ স্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না।...কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই তো মানব জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই তো বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।"

আয়ুর দীর্ঘতা দিয়েই শুধু যারা বস্তুর সত্যাসত্যের নির্ধারণ করে তাদের কাছে উঠোনের ধারে এক বেলার জীবন নিয়ে যে ফুল ফোটে, তার থেকে মশলাপেশা নোড়াটা ঢের সত্য, কেননা ও যে ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। এতবড় জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্তের ওপর অজিত আর কিছু বলতে না পেরে বললে, "এ শুধু তোমার রাগের কথা।" কমল বলে, "রাগ কিসের ? ফুল যে বোঝে না, তার কাছে ঐ

পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্যি। শুকিয়ে ঝরে যাবার শংকা নেই, ওর আয়ু একবেলার নয়, ও নিত্যকালের।"

কিন্তু "অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কালব্যাপী রহে নাই রহে
তবু সে মহান্॥......"

গাছের ফুলের সঙ্গে শোলার ফুল, ফুলের সঙ্গে শিল নোড়ার এতবড় জ্যান্ত দৃষ্টান্তের কথা স্থায়িত্বধর্মীরা ভেবে দেখেনি। মজা এই যে, নিজের কথাকে প্রমাণ করবার আকুল আগ্রহে তারা নিজেদের দৃষ্টান্তগুলির বাইরে যেমন আর কিছু দেখতে পায় নি, তেমনি নিজেদের দৃষ্টান্তের মধ্যেও যে ফাঁক থেকে যায়, তা-ও টের পায় না। অজিত বলছে, "কুহেলিকা যতবড় ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে, সূর্যই ধ্রুব।" কিন্তু এ তারা টের পেলে না যে সূর্য যেমন আছে, কুহেলিকাও তো 'নাই' হয়ে যায় নি। নাই নাই করেও তো সেই অনাদি কাল থেকেই সে-ও ধ্রুব সূর্যের পাশাপাশি থেকেই যাচ্ছে। "কোন্ আদিমকালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্যকে সে বার বার আবৃত করেছে, এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়তো ও দুটোই নিত্যকালের।"

এইভাবে সমস্ত বইটির মধ্যে প্রধান ঘটনা কমলের জীবন এবং অন্য নানা বিভিন্ন ঘটনা ও আলোচনার মধ্যে ক্ষণকালের সত্যতার কীর্তন করা হয়েছে। এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ যে কমলের জীবনে বাচনিক তর্কসৌষ্ঠব নয় তার জীবনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ধারা—কমলের জীবনের ঘটনাই তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে।

শিবনাথের সঙ্গে শৈবমতে কমলের বিয়ে হয়েছে—ও-রিতির আজকের সমাজে আর চলে না। যদি কোনদিন শিবনাথ হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চায়, সেদিন হয়েছে বলে প্রমাণ করবার কমলের কিছুই থাকবে না। অবিনাশের এ কথার উত্তরে কমল বলেছিল যে অন্তরের সম্বন্ধ যাবে মিথ্যে হয়ে, আর বাইরের অনুষ্ঠানের জোরে তাকে প্রমাণ করিয়ে নেওয়া? কমলের পক্ষে সে সম্ভব নয়। তারপর একদিন যখন সত্যি সত্যি সে ঘটনা ঘটল, তখন কি হল? অজিতের মুখে কমল প্রথম শুনতে পেলে শিবনাথ ঐ শহরেই আছে, বাইরে যায় নি ঃ তাহলে সে কমলের কাছেই আত্মগোপন করে আছে! কমল "শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের ওপরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন······স্মৃতিসৌধের তীরে বসিয়া যে কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।"

একদিন একবারের জন্যও পরের কাছে এজন্য সে নালিশ জানায় নি; একবারের জন্যও নিজের কাছেও নিজেকে ধিক্কার দেয় নি। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। ফিরে পেতে তাকে আর কমল চায় না। কিন্তু আশুবাবু যখন বাড়ী থেকে বার করে দিলেন শিবনাথকে, তখন সে তা সইতে পারলে না। গেলো তার সেবা করতে। রোগ গুরুতর নয় কিংবা রোগ মোটেই নয়। শিবনাথকে বললে সে চলে এলো তার জন্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ কথা শিবনাথ তাকে জানিয়ে এলো না কেন? তাকে একদিনের জন্যেও তো কমল ধরে রাখতো না। শিবনাথের সম্পর্কে কমল উষ্মাও রাখে নি, উচ্ছ্বাসও রাখে নি। তার কাছে "হৃদয়ের আদালতে এক তরফা বিচারই একমাত্র বিচার। তার তো আর আপীল কোর্ট মেলে না।" শিবনাথকে দণ্ড দেবার প্রস্তাবে শিউরে উঠে কমল বললে, 'না'। হরেন্দ্র বলছে "সে 'না' র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপর হতে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই, দাক্ষিণ্য যেন অবিকৃত করুণায় ভরা।.........একদিন যাকে ভালবেসেছিল, তার প্রতি নির্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ কোরে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা হুতাশ নয়—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেলো।"

আশুবাবুর কাছে কমল নিজে বলছে, "দুঃখ যে পাই নি, তা বলিনে। কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নেই নি। শিবনাথের দেবার যা ছিল, তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েছি—আনন্দের সেই ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্তদাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি। শুকনো ঝরণার নিচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূণ্য দু-হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকি নি। তাঁর ভালোবাসার আয়ু যখন ফুরুলো, তাকে শান্ত মনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধূয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তিই হলো না। অপরাধের চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।"

শিবনাথ যে না জানিয়ে চলে গেল, এইটে কমলকে পীড়া দিয়েছিল। শিবনাথের সকল লুকোচুরি, ছলনা, মিথ্যাচার তাকে অপমানও করেছে। রাজেনের কাছে সে বলেছে যে টাকার লোভটা যে শিবনাথের এত বেশী ছিল, এ সে আগে জানতে পায় নি। পারলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতে পারতো। সে এ-ও বলেছে, "পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েছে।" এই কথাগুলি শিবনাথের প্রতি কমলের কিছু বিরূপভাবের ইঙ্গিত দিলেও তার প্রতি সত্যি করে কোন বিদ্বেষ সে জিইয়ে রাখে নি—একথা প্রমাণ

করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আমরা আগেই এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তিই দেখিয়েছি। আরও একটা এইখানে পাচ্ছি। রাজেন তাকে জিজ্ঞেস করলে পীড়িত শিবনাথের ওখানে গিয়ে সে কি করবে? কমল বলছে, "নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। যদি প্রয়োজন হয়, থাকবো। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এ জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই। বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।"

যাই হোক্, সে যখন বলেছিল "যা পেয়েছি, তার বেশি কেন পাই নি এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই" তখন সে সত্য কথাই বলেছিল, মিথ্যে দিয়ে নিজেকেও ভোলায় নি, অপরকেও না। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করলে এই-ই প্রমাণ করবে যে, যা নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতে তার লজ্জাই বোধ হয়; যতটুকু শিবনাথ পেরেছে, তার বেশি কেন পারল না বলে রাগারাগি করতে সত্যিই তার মাথা হেঁট হয়। এ সম্বন্ধে যত কথা সে বলেছে, তা সে পুরোপুরিই রক্ষা করে এসেছে। তার জীবনে শিবনাথের আসা এবং যাওয়া একটি ঘটনা এবং অনন্তের মাঝে সেটি একটি ক্ষণমাত্র। যতক্ষণ সে ছিল, ক্ষণের পূর্ণ সত্য নিয়েই ছিল, যখন গেল, তখন গেলই। ব্যস্, তারপরে আবার কমল

চললো সামনের দিকে—সেইখানে অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে তার জীবন চলতে থাকবে।

আশুবাবু বলেছেন, "এ তো বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা শিখেছে, একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেছে। কতটুকুই বা বয়েস, কিন্তু নিজের মনটাকে এই বয়সেই যেন সম্যক্ উপলব্ধি করে নিয়েছে।" হরেন্দ্র বলছে, "ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। ওর যেমন কথা তেমনি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝে থাকে, তবে সে মিথ্যেরও গৌরব আছে।"

—এই যে কমল ক্ষণিকের মহিমা কীর্তন করল এবং নিজ জীবনে তার সহজ প্রকাশ দেখাল, এই যে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত যে-ঘটনার সমজাতীয় সাতত্য নেই তাকেও পুরোপুরি সত্য বলে স্বীকার করে নিল, একদিনের আনন্দকে আর একদিনের নিরানন্দ দিয়ে ম্লান করে দিল না, শেষ ফল দিয়ে পথচলার বাস্তবকে বিচার করল না—এদের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে কোন্ যুক্তি বা জীবনের আলোয়? প্রাণচঞ্চল কমলের এই যে জীবনদর্শন, এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ, এই বর্তমান ভজন—একে সমর্থন করতে পারা যাবে কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে?

যে প্রাণকে স্বীকার করার ফলে কমল প্রচলিত বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছে কমলের এই ক্ষণকে, চাঞ্চল্যকে, বর্তমানকে স্বীকারও সেই প্রাণ স্বীকারের ফল।

বুদ্ধির দৃষ্টিতেই একমাত্র এক সত্য, একদিন যা ঘটেছে তা-ই চিরদিন ঘটতে থাকবে—এ-ই সত্য। কিন্তু জগৎটা যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, আজ যেটা যেরূপে আছে, কাল সেটা সেইরূপেই থাকবে—এ যে নূতনকালের ন্যায়-শাস্ত্রসম্মত নয়, কালকের আবেষ্টন আর আজকের আবেষ্টন একই রকম না থাকার জন্য বস্তুর সত্যতার রূপটাও যে যায় বদলে, এ কথা জগৎ ও জীবনের দিকে তাকিয়ে আজ বলবার দিন এসেছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্ষণের একটি স্বয়ংপূর্ণ মূল্য আছে, যাকে একেবারে অস্বীকার করে অপর একটি কিছুর মাপকাঠিতে তাকে চিরদিনের জন্য বেঁধে দেওয়া যায়ই না। সংসারে অপর একটি কিছুর—তা ঘটনা বা বস্তু যা-ই হোক্ না কেন—সঙ্গে যুক্ত হওয়া অপরিহার্য বটে, কিন্তু সেই যুক্ততার প্রশ্নে কোন একটিকেই একেবারে অপরটির মত বা অপরটির জন্য করেই ব্যবস্থা করা যাবে না, একের মানদণ্ডে অপরের স্থান ও মান নির্দেশ করা যাবে না, এই কথাটিই আজ সর্ব ক্ষেত্রে—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—প্রকাশ পেতে চাইছে। তাই বলতে হয়েছে, ব্যষ্টির, ক্ষণের, বর্তমানের, চঞ্চলতার একটি সত্য সার্থক মুল্য আছে। এরা অনিত্য বটে কিন্তু অসত্য নয়।

ভারতবর্ষ তার প্রচলিত অদ্বৈতবাদের প্রজ্ঞাকেন্দ্রিক চিন্তা-ধারায় এই ক্ষণের স্বয়ংমূল্য স্বীকার করতে পারে নি। আজ তারই প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতিতে একদল আবার

সাতত্যের দিকটিকে একেবারেই অস্বীকার করে ক্ষণকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একপক্ষকে চূড়ান্ত অস্বীকারের মধ্য দিয়ে অপর পক্ষের যে অস্তিত্ব লাভাকাঙ্ক্ষা, তা প্রকৃতির বা বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম নয়। ওতে শ্রেণী সংগ্রামের অন্তহীন রক্তাক্ত পথে পারস্পরিক অকল্যাণের বীজ উপ্ত হয়। হয়তো সাময়িকভাবে দেখা যেতে পারে যে, কোন একটি দিকের—বিশেষ করে যে এতদিন নিপীড়িত হয়ে এসেছে তার—লাভ সবিশেষ, তবু এ কথা আজ আমাদের মানতেই হবে যে পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করতে পারি তা আমাদের নিতেই হবে। নয়তো সেটা যেমন হবে অবৈজ্ঞানিক তেমনি হবে মূর্খতা। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কোন একটি দিককে একান্ত করে ধরে পথচলা নির্দেশ করার দরুণ পরস্পরস্পর্ধিতার পারস্পরিক বিদ্বেষই শুধু জেগে উঠেছে—যার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিচ্ছে পরবর্তী বিদ্বেষ বহ্নি প্রকাশের পথ খোঁজায়।

আমরা জেনে এসেছি যে, যা নিত্য পরিবর্তনশীল, পরিণামধর্মী, প্রতি মুহূর্তে যা বদলে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে, তা সত্য নয়, তার কোন বাস্তবিকতা নেই; সমস্ত ক্ষয় ক্ষতির বাইরে যা অচঞ্চল ধ্রুব নিত্য, তাই বাস্তব, তাই সত্য। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ বলছে প্রতি মুহূর্তে যে ক্ষণগুলি বদলে যাচ্ছে, সেই ক্ষণগুলির প্রত্যেকের যেমন একটা

বাস্তব সত্যতা আছে, তেমনি এই বদ্‌লে যাওয়াটাও একটা বিশ্ব বিধৃত সত্য—যাদের কোন অস্বীকৃতি, কোন না-মানাই মিথ্যে করে দিতে পারবে না। দেশকালের মধ্যে বস্তুর সত্যতা পরীক্ষা করতে হলে সে কখনও লম্বা, কখনও চওড়া, কখনও গোল, কখনও চৌকোণ, কখনও চ্যাপ্টা, কখনও ভোঁতা—এক রকম সে হতেই পারে না। কিন্তু এক রকম না হতে পারাটাই তার মিথ্যাত্বের প্রমাণ নয়। সে বদলাচ্ছে, বদলাবে। ঐ তার ধর্ম, ঐ তার সত্য।

এই যে আমাদের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ—২৫০০ বৎসর আগে ভগবান বুদ্ধ এ আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান জগতের আবেষ্টনে এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ আবার স্থান পেতে চাইছে। বর্তমানের পাশ্চাত্য মনিষী বার্গসঁও আজ সেই কথাটিই বলেছেন। এ সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন, "A wonderful philosophy of dynamism was formulated by Buddha 2500 years ago, a philosophy which is being recreated for us by the discoveries of modern Science and the adventures of modern thought. The electro-magnetic theory of matter has brought about a revolution in the general concept of the nature of physical reality. It is no more static stuff but radiant energy. An analogous change has pervaded the world of psychology, and the title of a

recent book by M. Bergson, "Mind Energy", indicates the change in the theory of psychical reality. Impressed by the transitoriness of objects, the ceaseless mutation and transformation of things, Buddha formulated a philosophy of change. He reduces substances, souls, monads, things to forces, movements, sequences and processes, and adopts a dynamic conception of reality. Life is nothing but a series of manifestations of becomings and extinctions. It is a stream of becoming. The world of sense and science is form moment to moment. It is a recurring rotation of birth and death. Whatever be the duration of any state of being, as brief as a flash of lightning or as long as a millennium, yet all is becoming. All things change……Life is no thing or state of a thing, but a continuous movement or change. It is the Bergsonian attitude in germ."

—বর্তমান জগতের বিজ্ঞান ও চিন্তার অগ্রগতির মধ্য দিয়ে ভগবান বুদ্ধের ঐ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ নূতন করে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো। বস্তুর ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক্ থিওরী

প্রকৃতি-জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বস্তু আজ আর গতিশূন্য নিশ্চল পদার্থ নয়। সে আজ সমুজ্জ্বল শক্তি বিশেষ। মনোবিজ্ঞানেও অনুরূপ একটি পরিবর্তন এসে গেছে। বার্গসঁ রচিত "মাইণ্ড এনারজি" নামে সম্প্রতি প্রকাশিত বইটি তার সাক্ষ্য দেবে।

বস্তুর স্বল্পায়ু লক্ষ্য করে, তার অন্তহীন পরিবর্তন, রূপান্তরকরণ দেখে দেখে বুদ্ধদেব পরিবর্তনের এক দর্শন স্থাপনা করলেন। তিনি বস্তু, পদার্থ, পরমাণু বা আত্মাকে শক্তি, গতি, পরিণাম বা পরম্পরা বলে স্থির করলেন। বাস্তবের তিনি একটি গত্যাত্মক ধারণা করে নিলেন। জীবনটা হওয়া এবং মুছে যাওয়ার অন্তহীন প্রকাশের একটি ধারা ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যে জগৎ—এ ক্ষণের থেকে ক্ষণে নেচে নেচে চলে। এ জন্ম-মৃত্যুর এক আবর্ত্তমান চক্রবৎ ঘূর্ণন। কোন একটি ক্ষণের অস্তিত্ব সময়ের পরিমাপে যাই-ই হোক্ না কেন—বিদ্যুত-চমকের মত ক্ষণিক কিংবা সহস্রবর্ষের দীর্ঘস্থায়ী —সেই প্রত্যেকটি ক্ষণই "হয়ে" চলেছে। সবই বদলে যাবে। বার্গসঁও এই-ই বলতে চেয়েছেন। জীবনটা কোন বস্তু কিংবা কোন বস্তুর অবস্থাবিশেষ নয়, একটি অবিচ্ছিন্ন গতি বা পরিবর্তন। জীবন নদীর এই অন্তহীন স্রোতধারার অবিচ্ছিন্নতার দিকে চেয়ে চেয়ে সেই সুপ্রাচীন কালের বুদ্ধদেব আর আজকের দিনের বার্গসঁ গেয়ে উঠলেন,

"যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়
পুণ্য হই সে চলার স্নানে
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতি ক্ষণ।"

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ সমর্থকেরা বিশ্বের এই চলার ছন্দকে, এই ক্ষণিক আস্বাদনকেই একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করে গেছেন। আর একেই একেবারে অস্বীকার করে বেদান্তের সাতত্যবাদী ভাষ্যকারগণ সাতত্যেরই বিজয়তোরণ ভারতবর্ষের বুকে রচনা করে তুলেছিলেন। পারস্পরিক খণ্ডনময় এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা শাস্ত্র ও জীবনের মধ্যে ব্যর্থতাই সৃষ্টি করে এসেছে। তাই বিশ্বের এই চলার ছন্দকে, এই ক্ষণিক আস্বাদনকে সত্য বলে জানতে গেলে তারই সত্য অপরার্ধ, স্থিরতা, সন্ততধারা, অচঞ্চলতা, সনাতনত্ব প্রভৃতিকে তার সাথে জোড়া দিয়ে এক অখণ্ড জীবনদর্শন আস্বাদন করতে হবে। তাই কবি গাইলেন,

"অচঞ্চলের অমৃত বরিষে চঞ্চলতার নাচে
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে নেই নেই করে আছে।

ভিৎ ফেঁদে যারা তুলিছে দেয়াল
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল
তারা জানিল না অনন্তকাল অচিরকালেরই মেলা।"

—চঞ্চল এই বিশ্বপ্রকৃতির পরতে পরতে অচঞ্চল ছড়িয়ে আছে, অচঞ্চল যখন বিশ্বপ্রকৃতির চঞ্চলতার মাঝে নিজেকে হোম করে, নিজেকে ওর মধ্যে নিঃশেষে মুছে ফেলে, তখনই সুরু হয় অচঞ্চলতার অমৃত বরিষণের মাঝে চঞ্চলতার নাচন, তখনই বিশ্বলীলা কেবলই নেই নেই করেও থেকে যায়, তখনই সব অনিত্য নিত্য নাচন নাচে, তখনই অনন্তকাল ধরে অচিরকালেরই মেলা চলে।

এ বিশ্ব ক্ষণিকের মেলা, এ জগতে ঘটনাগুলি সবই ক্ষণিক। ক্ষণিক আস্বাদন ছাড়া প্রকাশের ক্ষেত্রে আর কিছুই সম্ভব নয়। কিন্তু এই ক্ষণিক আস্বাদনকে সম্ভব করে সর্বক্ষণিকের অতীত ও সর্বক্ষণসমন্বিত প্রাণস্তর, অখণ্ড জীবনের মধ্যে যা বিধৃত। এই জীবনের বাইরে একান্ত সনাতনত্ব, একান্ত স্থিরতা বা সন্ততধারা কিংবা একান্ত ক্ষণ, একান্ত চঞ্চলতা আপোষহীন পরস্পরস্পর্ধী প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র। সাতত্য, স্থিরতা, অচঞ্চলতা স্বীকার না করলে সৃষ্টি যেমন সয়তানের বাস্তব নৃত্যে পরিণত হয়, আবার একান্তভাবে তাদেরকেই স্বীকার করলে মানুষের সকল শক্তির সহজ বিক্রীড়ন শৃঙ্খলিত হয়ে যায় অনন্তত্বের সনাতনত্বের শৃঙ্খলে, সাতত্যের নেশায় ক্ষণমাধুর্যাস্বাদনে বঞ্চিত হতে হয়, ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্র্য চূর্ণীকৃত হয়ে যায়; তখন মানুষের পক্ষে গভীরতর মরণ যে ক্লৈব্য, ঐ ক্লৈব্যই লাভ হয়। তাই আজ অতীত, সনাতনত্ব, সন্তত ধারা ও অচঞ্চলের অমৃত বরিষণের মাঝে স্বীকার করতে হবে ক্ষণকে, বর্তমানকে, খণ্ডকে, চঞ্চলতাকে।

জগৎটা যখন একটা জীবন যন্ত্র (organism) তখনই তার মধ্যে বুদ্ধি ও হৃদয়ের, ক্ষণ ও সাতত্যের স্বয়ংপূর্ণ সত্য মূল্য ও স্থান থাকে। কেননা জীবন যন্ত্রের মধ্যেই শুধু প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশ বা ক্ষণও স্বয়ংপূর্ণ ও সেই সঙ্গেই তা সমগ্র বা সাতত্যের মধ্যে বিধৃত। সনাতনত্বের সঙ্গে তখন প্রতি ক্ষণগুলির জীবন্ত সম্বন্ধ এইরকম দাঁড়ায় যে প্রতিটি ক্ষণের মধ্যেই একটি অখণ্ড সনাতনত্ব থেকে যায়। এইরকম অনন্ত সনাতন ক্ষণগুলির হাত ধরাধরিতে অতীতে-বর্তমানে, ক্ষণে-সাতত্যে, চঞ্চলে-অচঞ্চলে মিলেমিশে গড়ে ওঠে সমগ্র জগৎ ও জীবন। তখনই অতীতের বুকে বর্তমানের হোম, ক্ষণের মধ্যে সাতত্যের আস্বাদন। তখনই "চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি"—এ সার্থক। ওদের কোন একদিককে বাদ দিয়ে অপরদিক সত্য নয়, স্বাভাবিক নয়, বস্তুর বা প্রকৃতির তা ধর্মও নয়। এই দুয়ে মিলে যে সহজ জীবনপ্রবাহ এ বিশ্বে সেই কোন্ অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত পাওয়া, না-পাওয়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, যাওয়া-আসার মধ্য দিয়ে নৃত্য করে চলেছে

"তারে নিয়ে হলো না ঘর বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,

এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।”

তাই এই জগৎসংসারের স্থূলসূক্ষ্ম সকল স্তরে প্রেমের জাল বোনা ছাড়া করণীয় আর কিছুই নেই।

আকস্মিকের মালা-গাঁথা এই বিশ্বে বিশেষ বিশেষ আবেষ্টনে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণ সৃষ্ট হয়। বাল্যে আমার যে ক্ষণ, যৌবনে কি সেই ক্ষণই ?—নয়, প্রত্যেকটিই নূতন, প্রত্যেকটি ক্ষণের আস্বাদনও নূতন। অথচ একটি অখণ্ড সন্তত জীবন-ধারাই বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য ও জীবনমরণের বিভিন্ন স্বয়ংপূর্ণ ক্ষণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। এই বিভিন্ন ক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও স্বয়ংপূর্ণত্ব ভেঙ্গে একত্ব প্রচার কালের উপর বলপ্রয়োগ। প্রতিটি বিশেষ আবেষ্টনের, বিশেষ ক্ষণের বৈশিষ্ট্য রেখেই যে ঐক্য, যে সন্ততধারা—তা-ই বাস্তব ঐক্য, বাস্তব সাতত্য। এ না হলে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বময় সংঘর্ষ ও তার ফলে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া অখণ্ড জীবনের পক্ষে আর কিছুই লাভ হয় না। বাল্যের মত করে বাল্যকে, যৌবনের মত করে যৌবনকে, আজকের মত করে আজকে, কালকের মত করে কালকে, অতীতের মত করে অতীতকে, বর্তমানের মত করে বর্তমানকে, বিশেষ ক্ষণের মত করে বিশেষ ক্ষণকে নির্দ্বন্দ্ব আস্বাদনই সার্থক জীবনপ্রবাহ। এমনই প্রত্যেকটির

মত প্রত্যেকটি অনন্ত ক্ষণ নিয়ে জীবন। ক্ষণ শব্দের অর্থ উৎসবও, তাই তো জীবন উৎসবময়।

জীবনের অনন্ত ক্ষণের প্রতি ক্ষণকে প্রতি ক্ষণ হিসেবেই আস্বাদন করতে হবে, কোন একটি ক্ষণে আটকে পড়ে অন্য নির্দ্বন্দ্ব ক্ষণে পরিণত হতে না পারার তামসিকতা জীবনধর্মীর থাকতে পারে না। বাল্যস্মৃতি দ্বারা বেঁধে যৌবনকে তার স্বচ্ছন্দ গতিপথে চলতে বাধার সৃষ্টি করা চলবে না, আজকের ভিতের ওপরে ঘটনার যে দেয়াল গাঁথা পড়ল, সে দেয়াল কালকের পথচলার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙাতে পারবে না। সহজ জীবনপ্রবাহ জীবনের ভালমন্দ, হাঁ-না-এর কোন আটকে যাওয়াই (fixation) স্বীকার করে চলে না। এমন হলেই কোন্ এক অনির্বচনীয় পরিণামের ভিতর দিয়ে জীবন আজকের তীর থেকে কালকের তীরে, বাল্যের থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলে।

যদি প্রশ্ন করা যায় যে প্রতিটি ক্ষণ যদি তার মত হয়, জীবন যদি ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেতেই থাকে, তবে প্রথমের সঙ্গে শেষের সঙ্গতি থাকে কি করে? আজকের ঘটনার একটি ক্ষণকে আজকের মত করেই আস্বাদন করতে গেলে জীবনের অনন্ত বিভিন্ন ক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় কি?

এর উত্তর আমরা আগেই দিয়ে এসেছি। জীবনধর্মী যদি কোন বিশেষ ক্ষণের বিশেষ কিছুর আস্বাদনে আটকে না পড়ে, তবেই তার সকল বদলে যাওয়ার, সকল নূতন নূতন

ক্ষণের মধ্য দিয়েও তার সাতত্য, তার অখণ্ডত্ব বজায় রাখতে পারে। জীবনবাদ তো সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন একান্ত একক ক্ষণই স্বীকার করে না। সে যে অচঞ্চলের অমৃত বরিষণের মধ্যে চঞ্চলতার নিত্য নাচন আস্বাদন করে; সমগ্র চুম্বিত জীবন-ধারার মধ্যে স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংমূল্যবান বর্তমান ও ক্ষণ স্বীকার করে। বুদ্ধির হিসেবের মধ্যে একে আনতে গেলে আগে থেকেই সে সাতত্য অনেকটা অনেক সময় ধরা পড়বে না বটে কিন্তু জীবন্ত জীবনের মধ্যে—যেখানে বুদ্ধি ও হৃদয় পরস্পরের কাঠিন্য গালিয়ে দিয়েছে—,মানুষের বিচ্ছিন্ন 'অহংতা'র পূর্ণ নিরসনের পথে অতীত ও বর্তমানের, ক্ষণ ও ক্ষণাতীতের বিচিত্র সমঞ্জসের সঙ্গতি পাওয়া যাবে। ক্ষণ ও সাতত্য যে পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় না তার কারণ জীবনের মধ্যে এমন একটি সহজ শক্তি আছে, যে প্রতিটি ক্ষণের স্বয়ংপূর্ণত্ব ও স্বয়ংমূল্যত্ব বজায় রেখেও ঐ স্বয়ংপূর্ণ ও স্বয়ংমূল্যবান অনন্ত ক্ষণসমূহের অতীত থাকবার সামর্থ্য রাখে। সে শক্তি ক্ষণেরও বাইরে, ক্ষণসমূহেরও বাইরে, ক্ষণাতীতেরও বাইরে—তাই গোজামিল দেওয়ার দরকার হয় না।*

মানুষ যখন ক্ষণের সঙ্গে সাতত্যের, বিশেষ ক্ষণের সঙ্গে অন্য বিশেষ ক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না, তখন সে যেমন কোন বিশেষ ক্ষণাস্বাদনে আটকে পড়ে, তেমনি তখন

---

* বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তের সাতত্যবাদ (continuity) কি করে পুরুষোত্তম বস্তুতে সমন্বিত হল, অন্য ভাষ্যকারগণ সেখানে কেবল খণ্ডন করেই গেছেন, তার দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পাওয়া যাবে।

সে জীবনকে দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে দেয়। কেননা জীবনের মধ্যে ছাড়া, যে জীবন স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণ হয়েও চির আপূর্যমান, জীবনগত ঐক্য ছাড়া এই ক্ষণ ও ক্ষণাতীতকে শুধু বুদ্ধির মধ্যে মেলান যাবেই না, কোন ঐক্যও বের করা যাবে না। বাইরের তাৎকালিক আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি এবং নির্দ্বন্দ্ব আত্মাস্বাদন—এ ছাড়া ক্ষণ ও ক্ষণাতীত মিলে গেছে যে সহজ জীবনের মধ্যে, তাকে পথ দেখাবার সহজ নিশানা আর কী থাকতে পারে ?

শেষপ্রশ্নের প্রাণধর্মের উপাসক কমল প্রচলিত প্রজ্ঞাবাদী অদ্বৈতদর্শনের বিপরীত ঐ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কমল প্রাণের স্বচ্ছন্দ একটি ধারা, যার মধ্যে প্রতিক্ষণ তার মূল্যে আস্বাদিত হয়েছে। এক ক্ষণকে, এক ঘটনাকে আর এক ক্ষণে, আর এক ঘটনায় অযথা টেনে এনে কালের উপর, বস্তুর বা জীবনের স্বধর্মের উপর সে জুলুম করে নি। কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কেই তার কোন আটকে যাওয়া নেই, যা জীবনকে সম্মুখের বাস্তবতার দিকে অনায়াস চলনে প্রতিহত করে ফেলে। তাই তার গতি অবাধ। অর্থাৎ বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে কোন বিশেষ ধারণা বা বোধকে সে একান্ত করে ধরে রাখেনি। কালের পটভূমিকায় বিশ্বের মধ্যে বস্তুর প্রকাশ প্রতি মুহূর্তেই নব নব—তাকে কোন একান্ত বিশেষেই আটকে রাখতে গেলে জীবন তিক্ত বিস্বাদে ভরে ওঠে। এই ভরে না ওঠবার দৃষ্টান্তই কমল।

ক্ষণ, বর্তমান ও পরিবর্তন সম্বন্ধে এতখানি আলোচনার পর আমরা কমলের সেই "সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি আজকের না-থাকাটাও তত বড়ই সত্যি"—এ মন্তব্যের অনেকটা জবাব পেয়ে গেছি। এর পরের স্তরে এ কথাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্টতর হয়ে উঠবে।

কমলের কাছে জীবনের অর্থ, জীবনের মূল্য কি রকম? আশুবাবু বলেছেন, "জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র, আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্টও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখের পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তা-ই, যা আজও এসে পৌঁছয় নি। তাই ওর আসাও যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোন মতেই সম্মত নয়।" শিবনাথের ছেড়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে কমল যেভাবে গ্রহণ করেছে, সেটাই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের প্রতি তার দৃঢ়নিষ্ঠা প্রমাণ করবে। মনটাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করালে যে মানুষের পক্ষে কি নিজের কাছে কি পরের কাছের সমস্ত নালিশ মিটে যায়, সে কথা কোন্ ভাষায় প্রকাশ পাবে? সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি, সম্পদ—কিছুই তো কমলের ছিল না, তবু শিবনাথ যখন চলে গেল ভরা নদীর মাঝখানে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে, তখনও অত বড় নিঃসহায়তাও এই আশ্চর্য মেয়েটিকে কাবু করতে পারে নি। হরেন্দ্র বলছে, "আজও সে ভিক্ষা চাহে না, ভিক্ষা দেয়। যে-শিবনাথ তাহার এতবড়

দুর্গতির মূল, তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হইয়া যায় নাই।” এ সম্ভব হল কি করে? তার ক্ষণমাধুর্যময় সুষ্ঠু স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রাণপ্রবাহের জন্য। এই প্রাণের সহজ চলন কত জায়গাতেই তার জীবনে রূপ লাভ করেছে।

প্রাণের কথা হচ্ছে আনন্দের সুধাপাত্র অপব্যয়ের অন্যায়েই পূর্ণ হয়ে ওঠে। যাকে ভালবাসি, তার আনন্দসৃষ্টির জন্য অনেক কিছুই করে থাকি, বুদ্ধির হিসেবে যা অপব্যবহারেরই নামান্তর। যে কমল নিজের বেলায় অতি দরিদ্রের যা আহার সেই ভাতে ভাত ছাড়া খায় না—কেননা ওর বেশি তার সামর্থ্য নেই, সে-ই আনন্দের সুধাপাত্র পূর্ণ করতে অজিত—এবং হরেন্দ্রের জন্যও—বহু ব্যঞ্জনে রান্না করে। ভালবাসার পাত্রের আহারের জন্যও চৌদ্দ ব্যঞ্জনের ভোজ্যবস্তু তার প্রয়োজন-বহির্ভূত সন্দেহ নেই। বুদ্ধির বিচারে অন্যায় বলে তা অভিযুক্তও হবে। কিন্তু কথাটি হচ্ছে প্রাণের আনন্দ বহু ব্যঞ্জনের মধ্যে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অত ভোজ্য পদার্থ অজিতের জন্য না রেখে বুভুক্ষু মুচিদের দিয়ে দিলে বুদ্ধির দিক দিয়ে তা খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার বটে কিন্তু প্রাণের কাছে তার দাম নেই। যখন মুচিদের খাওয়াব, তখনই মুচিদের কথা উঠবে। যখন প্রিয়জনকে খাওয়াচ্ছি, তখন তার মধ্য দিয়ে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বুদ্ধির ঔচিত্যকে ছাড়িয়ে কিছুটা যাবেই। যে মানুষের উপার্জন শাকান্নের ব্যবস্থা দেয়, সে-ই তার প্রাণপুত্তলী সন্তানের জন্য ঋণ করে বসতেও দ্বিধা করে না। এমনি কত!

প্রাণের চঞ্চল দ্রুত। এই দ্রুতবেগের আনন্দাস্বাদনে কমল ভরপুর, মশগুল—কি জীবনে, কি গাড়ী চড়তে। অজিতের মোটরে প্রথম সে যেদিন বেড়াতে গিয়েছিল, সেদিন অজিত গাড়ী চালিয়েছিল খুব দ্রুত। কমলের পক্ষে সেটা হয়েছিল পরম আনন্দের কারণ। অজিত বললে দ্রুত চালানটা তার অভ্যাস। কমল জানালে এ অভ্যাস তো তার নেই, তবু তার খুব ভাল লাগছে, কেননা দ্রুত চলাটা তার স্বভাব। সে বলছে অজিতকে, "দ্রুতবেগের ভারি একটা আনন্দ আছে। গাড়ীরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি। কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা-যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুসী। নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না।"—প্রাণের চঞ্চলার এই-ই গতি। বুদ্ধি একে কষাঘাত করবে কিন্তু আনন্দের এই অপব্যয়টুকুর মধ্যেই মানুষের প্রাণের বিশ্রাম, বুদ্ধির হিসেবের মরুভূমির মধ্যে শ্রান্তিহরণকারী মরূদ্যানের স্নিগ্ধ ছায়া।

কমল সহজ প্রাণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে অব্যাহত ও সমুজ্জ্বল সে রাখতে পারে নি। কেন ও কোথায় তা আমরা ক্রমে দেখতে পাব।

কমল বলেছে, "এ জীবনে সুখদুঃখের কোনটাই সত্যি নয়; সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু।" সুখদুঃখ ভালমন্দের বিচিত্র ঘটনাবলী নিয়ে কমলের

প্রাণপ্রবাহের যে ছন্দের পরিচয় আমরা পেলাম তার মধ্যে সংযমহীনতার ছন্দপতন তো কোথাও নেই। বরং প্রাণের চলনের ঐ-ই একমাত্র ছন্দ।

প্রথম স্বামী মারা যাবার পর থেকেই কমল একবেলা স্বপাক ভাতে ভাত খায়—অতি দরিদ্রের যা আশ্রয়। কোন কারণেই এর নড়চড় হয় না—যদিও এ তার ব্রত নয়। জীবনধারণের প্রয়োজনে এই অবস্থাকেই তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল। কমল এ সম্বন্ধে বলেছে যে তার বাবা তাকে দিয়ে যেতে পারেন নি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার বীজমন্ত্র তাকে তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। এ তারই এক নিদর্শন। দারিদ্র্যচর্চ্চার নামে এ তার আত্ম-নিগ্রহ নয়, জীবনের আহার বিহারকে কমিয়ে ভাতে ভাত খেলে আত্মিক মুক্তি সহজলভ্য বলেও এ পথ সে নেয় নি। সে জানে একবেলা অর্ধাশনে কেবল অস্বীকারের মধ্য দিয়েই জীবনে বড় হওয়া যায় না। অভাবের আত্মোৎ-সর্গে সে কাণাকড়ি বিশ্বাস করে না। নিজকে ভরণপোষণ করবার তার নিজের যতটুকু ক্ষমতা আছে তাতে ওর বেশি চলে না, তাই সে অমন পথ নিয়েছে। কুলিমজুরের জামা সেলাই করে তাকে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয় অনেক সময়ই। তার আনন্দের মুহূর্তে সে পরকে খাওয়ায়, ষোড়শোপচারেও খাওয়ায় আবার আশুবাবু নীলিমার অনুরোধেও নিজে কিছু মুখে দেয় না। তখন নিজের আবেষ্টনানুযায়ী চলতে

পারার যে বাস্তব সংযম—তারই প্রতি তার দুর্লভ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু তার একদিনের আচরণ কিছুটা অর্থহীন গোড়ামির ও সেইজন্য তার প্রাণদর্শনের থেকে বিচ্যুতির পরিচয় দেয়। যেদিন রাজেনের সঙ্গে সে শিবনাথের শুশ্রূষা করতে এসেছিল, সেদিন রাজেনের অন্তর নিঃশব্দে কমলের দুদিনের না খাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করেছিল। তার নিজের ক্ষিদের যখন শান্তি হলো, তখনই রাজেনের মনে পড়ে গেল কমলেরও খাওয়া হয় নি দুদিন, তাই ওর জন্যেও কিছু নিয়ে এল। কিন্তু রাজেনের সে স্নেহের মূল্য কমল সেদিন দিতে পারে নি। সে বললে বটে 'এ আমার ব্রত নয়, অতএব ভঙ্গ করতেও পারি,' কিন্তু পারলে না। পারলে সে অধিক বিপ্লবপন্থীর পরিচয় দিত। অনেক সময় দেখা যায় বাইরে থেকে যেটাকে মনে হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া, আসলে সেইটেই জীবনকে পিছিয়ে দেয়। আর ঠিক সেইরকম বাইরে থেকে হয় তো মনে হবে এ বুঝি জীবনের পিছটান, আসলে সেইটিই মস্তবড় বিপ্লব। রাজেনের ঐ স্নেহের মূল্যটুকু দিতে না পেরে আমাদের মনে হয় বিপ্লবপন্থী কমল বিপ্লবের থেকে এক পা পিছু হটেছে আর তাইতে নিজেকে নিজে সে অপমান করেছে।

এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর বিবরণের থেকে মনে হয় কমল যখন শিবনাথের স্ত্রী শিবাণী, তখনও তার এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। এর কারণ বোধ-

হয় এই যে শিবনাথ সত্যিই ছিল দরিদ্র। কিন্তু কমল যখন অজিতকে স্বীকার করলে তখন সে নিয়ম সে লঙ্ঘন করেছে। "হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে তো আস নি, নিচে চলো। আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, এমনি তোমার বিচ্ছে, ও খেয়ে আসে নি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হলো—যা ও কখনো করে না। অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে, সে অভুক্ত আসে নাই।"

অতএব দেখা যাচ্ছে খাওয়া সম্বন্ধে—মানুষের অসংযমী হওয়ার, ভোগী হওয়ার যা একটি প্রধান পথ, সেইখানে সে কেমন সুন্দর সংযমী। সংযম তো খাওয়া বা না-খাওয়ায় নেই। ওটা ডাইনে বাঁয়ের পথ—আসলে সংযম রয়েছে কি মনোবৃত্তি নিয়ে খাওয়া বা না-খাওয়াটা ঘটল তার মধ্যে। সেইটে ঠিক না থাকলে বাইরের থেকে যা না-খাওয়া তা-ও ভোগ, শোষণ, অত্যাচার আর সেইটে ঠিক থাকলে বাইরে থেকে যা খাওয়া, তা সংযম, তা পোষণ, তা বৃহত্তর স্তরের ইঙ্গিতময়। প্রবৃত্তি যখন নিবৃত্তিময় তখনই তা সহজ কল্যাণকর।

কমলের মতে "সীমা মেনে চলাই সংযম।"—ত্যাগেরও সীমা, ভোগেরও সীমা। "শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব।" সে শক্তির স্পর্ধা ত্যাগেরও হয়, ভোগেরও হয়। সে যখন সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে চলে তখন তো "আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না।

সংযম সেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে, তখনই সে দুর্বহ। অতিসংযম যে আর এক ধরণের অসংযম" —এ কথা তো আমরা কোনদিন ভেবে দেখি নি। এই হচ্ছে কমলের সংযম, সহজ জীবনের সংযমও এই-ই। আমরা যতদিন ধরে নিয়েছিলাম যে জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না রাখলে মানুষ একাগ্র চিত্ত যোজনায় সফল হয় না, ওকেই "বলে যোগ, এ হিন্দুর অচ্ছিন্ন পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার", যতদিন বস্তুর সঙ্গে মানুষের ইন্দ্রিয় সংযোগের দ্বারা উপভোগ উপলব্ধি মাত্রকেই আমরা রিপু বলে গাল দিয়ে এসেছি, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংযম বলতেও বোঝাত বস্তু-সংযোগ থেকে চিত্তকে বঞ্চিত করে আনায়। ততদিন পর্যন্ত আমরা একমাত্র এই-ই জেনেছি যে "উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না," "ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হতে পারে না," "ও রিপু, ওকে মানুষের জয় করা চাই।"

আশুবাবু একটি খুব ঠিক কথা বলেছিলেন, "মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস করে ভোগ করতে চায়, ততই সে হারায়।" একথাই সত্যি যে মানুষ যখন আঁকড়ে ধরে গ্রাস করতে চায়, আর সব কিছু থেকে যখন সে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে আনে, তখনই সে হারায়, আর তখনই ভোগের তৃষ্ণা ক্রমেই বেড়ে চলে। কিন্তু এর থেকেই সিদ্ধান্ত করা

চলে না যে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগ মাত্রই তা হেয়, তা রিপু, তা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলে। মানুষ যখন কেবল ব্যক্তি, যখন সে নিজকে, বস্তুকে ও বস্তু-সংযোগকে তার বিশ্বরূপ সত্তা থেকে বঞ্চিত করে একেবারে ব্যক্তিগত করে তোলে, যখন সে ছন্দ—যে ছন্দ হচ্ছে স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বিত প্রকাশে—সেই ছন্দ ভুলে, সংযম ভুলে "আঁকড়ে ধরে গ্রাস করতে চায়" তখনই তা অসংযম। তখনই কমলের ভাষায়, সহজ জীবনের ভাষায় সীমা না মেনে চলার অসংযম, তখনই সংযম সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে।

যে সংযম অপরকে আঘাত করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায় সে বিকৃত সংযম, সে-ই সত্যি অসংযম। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা একের সংযমের দ্বারা অপরকে, জীবনের একদিকের সংযমের দ্বারা অপরদিককে আঘাত করেই এসেছি। সেইজন্য ভারতবর্ষের সনাতন চিন্তাপ্রণালী কোন সন্ন্যাসীদের মঠে মেয়েদের জন্য স্থান করে দিতে পারেনি, তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখতে পারেনি। এই আদর্শে প্রণোদিত হয়েই হরেন্দ্র অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমাকে তার আশ্রমে ঠাঁই দিতে পারেনি। মঠে যে মেয়েদের স্থান হয়নি, মেয়েদের জীবনে কি ধর্ম্মভাবের আচরণ একেবারে অনুপস্থিত? তার প্রকৃতির মধ্যেই কি এর প্রয়োজন নেই? মঠে মেয়েদের স্থান না হওয়ার মধ্য দিয়ে তো মেয়েদের সম্বন্ধে এই অবজ্ঞা, এই অবহেলার ভাবই ফুটে উঠেছে।

কেননা তাঁরা তো এ সত্য স্বীকার করে নেন নি যে পুরুষের মত নারীরও ধর্মজীবন আছে, জীবনের পরতত্ত্ব বুঝবার প্রয়োজন আছে।

তাই তো সনাতন ভারতের পুরুষের সংযম নারীকে আঘাত করেই এসেছে। জীবনের একটি বিশেষ সত্য বাস্তব দিকের বাস্তবতার, তার ছন্দের হিসেব না নিয়ে তাকে অস্বীকৃতির আঘাত করেই এতদিন ধরে চলে আসছিল। তাই নূতন যুগের সহজ জীবনদর্শন বলছে একের সংযম অপরকে, একদিকের সংযম অপরদিককে আঘাত করতে পারবে না। এ যারা করে তারা নিজেকেই টেনেটেনে বাড়িয়ে নিজেদের ভগবানকেই সৃষ্টি করে। "তাই ওদের ভগবানের পূজো ঘাড় হেঁট করে আত্মপূজায় নেমে আসে। এ ছাড়া ওদের পথ নেই।" কিন্তু ওরা যদি মানুষকে কেবল নর বলে ধরে না নিয়ে নর ও নারী এই দুয়ে মিলেই সে এক এই কথা মেনে নিয়ে ব্রহ্মচর্য, সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষার ব্যবস্থা দিত তাহলেই সেটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের ব্যবস্থা হতো। একাঙ্গের পক্ষাঘাতের উপরে অপরাঙ্গের মাল্যভূষণবিজড়িত কুৎসী সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতো না। সৌন্দর্য অর্থই সমঞ্জসের সৌন্দর্য। এক অর্ধেককে বাদ দিয়ে নিজেকে বৃহৎ করে পাবার যত চেষ্টাই মানুষ করুক না কেন, ওতে সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও খোয়ায়। এক অর্ধেক যখন নিজেকে কেন্দ্র করে আত্মার মুক্তির ব্যবস্থা পর্যন্ত চালু করে দিলে, অপরার্ধকে যে সে

তখন কেবল আঘাত করতেই থাকল, এ কথা তো তার দৃষ্টিতে আসে নি। আসে যে নাই, তার কারণ অপরাধ´কে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষের অপরিহার্য অপরাধ´ বলে স্বীকারই করে নি।

আজ আমরা বস্তুর সমগ্র স্বরূপকেই স্বীকার করি এবং তাই থেকেই সংযমকে গড়ে তুলব। প্রতি বস্তুর মধ্যে যে তাকে ডিঙ্গিয়ে তার অতীত একটি সত্তা আছে, আমাদের এতদিনকার সংযম গড়ে উঠেছিল বস্তুর সেই অতীতত্বটুকুর উপরে। আজ নূতন যুগে আমরা যখন সংযম গড়ব তখন বস্তুর ঐ নিজকে অতীত থাকার ধর্ম এবং বস্তুর অনুগ সত্তা—এই দুটোর মধ্য দিয়ে রওনা হব। তাহলেই আমাদের তা সহজ জীবনের সংযম হবে, তাহলেই সে সংযম সীমাকে না মানার স্পর্ধায় অসংযমী হয়ে উঠবে না, জীবনের আনন্দকে উদ্ধত আস্ফালনে ম্লান করে আনবে না। কেননা তখন ত্যাগও সংযত হবে, ভোগও সংযত হবে—কেউই নিজের সীমা অযথা ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে না। তখনই আমার সংযম যেমন অপরকে আঘাত করবে না, তেমনি আমার জীবনের একদিকের সংযম অপর দিককে বেঁধে রেখে তাকে বিকৃত করে তুলতে সাহায্য করবে না।

খাওয়া সম্বন্ধে কমলের সুসংযত সংযম—যা জীবনের প্রয়োজনের থেকে স্ফুরিত—আমরা তা দেখতে পেলাম। ওর বেশভূষা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতে পাই নি। কাহিনীর

রঙ্গমঞ্চে কমলের প্রথম আবির্ভাব থেকে শেষ পর্যন্ত কারো মুখ দিয়েই কিংবা লেখকের নিজেরও, কমলের বেশভূষা প্রসাধন সম্বন্ধে এমন কোন মন্তব্য বের হয় নি যাতে সে সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পাই। প্রথম থেকে বহুস্থানে বহুবার তার অতুলনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে; কিন্তু তার বেশভূষা প্রসাধনের বিন্দুমাত্র উল্লেখও নেই। শিবনাথের চলে যাওয়ার পর একদিন যখন নীলিমার নিমন্ত্রণে সে অবিনাশের বাড়ী এসেছিল তখন অবিনাশ দেখছেন, 'কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামাকাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য হইলেন। দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে।" সমস্ত বইটিতে বেশভূষা-প্রসাধন সম্বন্ধেও তার অসংযমের কোন পরিচয় নেই।

এখন দেখতে হয় তার জীবনধারা। একদৃষ্টিতে বিধবা কমলের শিবনাথকে শৈবমতে বিবাহ অসংযম, শিবনাথের চলে যাওয়ায় তাকে নিঃশব্দে ক্ষমা করা অসংযম এবং অসময়ে মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে বলে প্রভাতের আশা নিয়ে বসে থাকা অসংযম। এই দৃষ্টিতে কমল যদি প্রথমবার বিধবা হয়েই আর বিয়ে না করে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে আনবার কৃচ্ছ্র তপস্যা গ্রহণ করতো, তাহলেই হতো সবচেয়ে বড় সংযম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে হৃদয় বস্তুটি এবং সেই সঙ্গে জীবন তো চুপ করে বসে থাকে না, সে সচল পদার্থ। কোন একদিনের কোন একটা ঘটনা—যার বিশ্বজনীন

রূপ নেই—তাকে দিয়ে সমস্ত জীবনকে চিরদিনের মত বেঁধে রাখতে চেষ্টা করা বাতুলতা, কেননা হৃদয় বা বস্তুর স্বধর্মই তা নয়। যার যা ধর্ম নয়, তাকে জোর করে তাই করতে যাওয়াই তো অসংযম। জীবনের কোন একটি বস্তু বা ঘটনা, যার নিত্য নূতন হওয়ার সহজ ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে—তাকে একমাত্র ধরে নিয়ে তারই সঙ্গে মানুষের সমস্ত বর্তমান ভবিষ্যৎকে বেঁধে দেওয়ার প্রচেষ্টার ভিতর থাকে বুদ্ধি ও হৃদয়, প্রজ্ঞা ও প্রাণ মিলিয়ে যে সহজ জীবনদর্শন তাকেই অস্বীকার করা।

শিবনাথের দেওয়া যখন ফুরালো তখন কমল যে সে কঠিন সত্যকে সত্য বলেই মেনে নিল, সংসারের দেনাপাওনা লাভ ক্ষতির বিবাদ বাঁধিয়ে তাকে লোকচক্ষে হেয় করতে চাইল না—এ কত বড় সংযম! ভাবলে অবাক হতে হয়। সাধারণতঃ মানুষের এতবড় ক্ষতির কি প্রতিক্রিয়া হয়? কমল বলছে, "কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাদের সইল না। অরুচি অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তিতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হল মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হল সত্য?"—সেই হল সংযম? জীবনে যা ঘটে তাকে, সেই রুদ্র দুরন্ত সত্যকে এই যে গ্রহণ—এ কী সংযম নয়? এ হচ্ছে বাস্তব জগতের চলার

সংযম। এখানে প্রাণের ধর্মে সে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে; এর মধ্যে প্রাণের ধর্মের সহজ চলন ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এ ঘটে? এর প্রথম উত্তর হচ্ছে—এই তার ধর্ম; দ্বিতীয় হচ্ছে সেই বস্তুধর্ম কমলের পক্ষে সহজ না হয়ে কোন একদিকে অতিরিক্ত প্রবণতার জন্য হয়েছে কি না এবং তা কতটুকু—যথাস্থানে তা দেখতে পাব।

কমলের প্রাণের যে সহজ ধর্ম প্রাণের সংযমের রূপে ফুটে উঠেছিল তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেব।

তথাকথিত সভ্য সমাজের কাছে কমল একেবারে বাইরের লোক। সাক্ষাতে অসাক্ষাতে সেই সমাজ তাকে নিন্দা, বিদ্রূপ, কটূক্তি প্রভৃতি কিছুরই থেকে রেহাই দেয় নি। ঘরে বাইরে তার আপন বলতে তো কেউ ছিল না। তবু এর মধ্যে আশুবাবুরই স্নেহ পেয়েছিল সে সবচেয়ে বেশি। সেই আশুবাবুও কতবার তাকে অনিচ্ছায়ও আঘাত করে ফেলেছেন। এ ছাড়া মনোরমা, অজিত, হরেন্দ্র, সতীশের কষাঘাত এবং সর্বোপরি অক্ষয়ের বিষবান কতবারই তো তাকে বিদ্ধ করেছে। পুরুষসমাজের সম্মিলিত নিন্দা গ্লানি মিটিং করেও তার উপর বর্ষিত হয়েছে। বেলামালিনীর নিঃশব্দ অবজ্ঞার অপমানও তাকে পেতে হয়েছে, পীড়িত শিবনাথও তাকে পরম বেদনার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়েনি। তবু কোন একদিন কোন এক মুহূর্তের জন্যও তো কমল ধৈর্য হারায় নি, উত্তেজিত হয় নি, রাগ করে নি, তার স্বাভাবিক মৃদু হাস্যের অভাব ঘটে নি।

উদ্ধৃত করে এর প্রমাণ দেখাতে গেলে স্থান সংকুলান হবে না। তবু আমরা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থান তুলে দেব।

তাজমহলের তলে শাহজাহানের একনিষ্ঠ প্রেমের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কমল প্রচলিত নিষ্ঠাকে যখন বিদ্রূপ করল, তখন ক্রুদ্ধ মনোরমা নিজকে সামলাতে না পেরে অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে বলল, "এ মনোবৃত্তি আর কারোও না হোক্, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের চক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।" এ অপমানের উত্তরে "কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল।"

অক্ষয় একবার বলছে, "আপনার এসব কদর্য ধারণা আমাদের ভদ্রসমাজের নয়। সেখানে এ অচল। কমল তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল।..."

আর একদিন অক্ষয় বলল, "শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যিই বিবাহ হয়েছিল?" অক্ষয়ের এ নির্লজ্জ জিজ্ঞাসার উত্তরে আশুবাবু, অবিনাশ, হরেন্দ্র, অক্ষয়ের অবস্থা বর্ণনা করে কমল সম্বন্ধে লেখক লিখছেন, "কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল।..."

শিবনাথ চলে গেছে। ক্লান্ত কমল একদিন আশুবাবুর কাছে এসেছে। শুনতে পেলে অক্ষয় অবিনাশ সবাই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, অজিতও যোগ দিয়েছে সেই দলে। এমন সময় চক্রান্তকারী সকলেই এসে সেখানে উপস্থিত হল। তথাকথিত ভারতীয় নারী ও ভারতীয় সভ্যতার গুণগান

করে কমলকে যখন তারা শ্লেষ করলে, তখন আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন সে ওদের কথা মানে কি না। এরপর কমলের অবস্থা লেখক বর্ণনা করছেন, "অন্য সময় হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত কিন্তু, একে তার মন খারাপ তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ সদম্ভ প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসম্ভব সম্বরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু···?"

অক্ষয় খাঁটি লোক—সত্য কথা বলতে তার কোন সংকোচ নেই। একদিন আশুবাবু হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কমলের প্রেরিত পার্শীটিকে অপমান করে যে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অক্ষয় একসময় বলছে, "উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া-টতুয়া সেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন,—শিবনাথ তো দিব্যি গা ঢাকা দিয়েছেন—কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই তো! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে,—আশুবাবু আজ পূরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল কাল সকালেই লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া পরা চলছিলো না আমাদের তো সে কথা জানালেই হতো।

তাহার বলার বর্ব্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্ম্মাহত হইল। ······কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বলবেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।"

কারো কাছ থেকেই কিছু আদায় করবার মনোবৃত্তি কমলের

ছিল না। অজিত একবার তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। কমল অস্বীকার করল। অজিত বলল বন্ধুর কাছ থেকে কি কেউ নেয় না? কমল বললে, "কিন্তু আপনি তো বন্ধু নন।" এই পরাপেক্ষারাহিত্যের মধ্যেই রয়ে গেছে কমলের চূড়ান্ত সংযম।

পীড়িত শিবনাথের সঙ্গে দু'-চার কথা আলাপের পর "কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এত-বড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।" সুযোগ পেলেও, কারণ থাকলেও পরকে আঘাত না করতে পারা, অপমান না করতে চাওয়া যে কতবড় বাস্তব সংযম—এ কথা উপলব্ধি করতে কি আমরা পারব?

আশুবাবুর গাড়ীতে যেদিন অজিত ও কমল চলে যাওয়ার সংকল্প করছিল, সেদিনের কমলের সমস্ত প্রাণাবেগ কেমন সুসংযতভাবে প্রকাশ পেয়েছে!

আশুবাবু কমলকে তাঁকে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করতে বলেছিলেন। কমল সহজে রাজী হয় নি। মাঝখানে সে দুই একদিন সম্বোধন করেছিল, কিন্তু আবার বন্ধ করে দিয়েছিল। কাহিনীর শেষ অঙ্কে দেখি সে আশুবাবুকে কাকাবাবু বলেও সম্বোধন করেছে, এবং সেই প্রথম পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণামও করেছে। অপরের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে তার থেকে সুযোগ নেওয়া কমলের স্বভাবে নেই। সে মানুষকে ভালবাসে, কিন্তু সুযোগ নেয় না।

আশুবাবুকে কমল ভালবাসে, কমলকেও আশুবাবু ভালবাসেন। সেই আশুবাবুর কাছ থেকে আঘাত বা কটাক্ষ কত বড় বেদনার—বিশেষ সে যখন তার ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ে হয়। কিন্তু সে-ও কমল কত সহজে হজম করে ফেলে। রিপু সম্বন্ধে কমলের বক্তব্য শুনে আশুবাবুর মনে হলো সে বুঝি তাঁকেই খোঁচা দিলে। আশুবাবুর "কি যে হোলো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখো দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মতো কিছুই তো তার নেই,—কমল নিজেও বোধহয় আশ্চর্য হোলো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না, শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু।"

তাজমহলের নীচে মনোরমার খোঁচা খেয়ে নিজের সম্বন্ধে সে বলছে, "আপনি সত্যই বলেছেন, আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানবো প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্ত্তনের শক্তি নেই সেদিন বুঝবো এর শেষ হয়েছে,—এ মরেছে।" তার দেহ-মন প্রাণপূর্ণ, অথচ সংযত। তাই তো বাইরের আঘাত ওকে ক্ষেপিয়ে তোলে না, ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না। এমনি সারা বইটিতে ছড়িয়ে আছে কমলের প্রাণের সহজ সংযম। অত্যন্ত বর্বরোচিত ভাবে আক্রান্ত হলেও যে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সে হেসেই উত্তর দিতে পারে, তার কারণ

সে যা, তা তার রক্তমাংসচিন্তার মধ্যে অত্যন্ত সহজ—মুখস্থ করা বুলি নয়। এইজন্যেই তার কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া নেই, আপন আত্মার বিস্তারে আপনি চলে। তা ছাড়া সে এ-ও খুব ভাল করেই জানে যে, সে যা বলতে চাইছে, প্রশ্নের এই অপর দিকটি মানুষের কাছে আজও একেবারেই নূতন, তাই আঘাত আসবেই, দুর্বিনীত আক্রোশে অক্ষয়-মনোরমার দল আক্রমণ করবেই।

এই যে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের আত্মশক্তিতে দৃঢ় থাকা, সমস্ত অপমানের মধ্যেও ক্ষুব্ধ না হওয়া, কারণ থাকলেও অপরকে আঘাত বা অপমান করবার ইচ্ছে পর্যন্ত অন্তরে জাগ্রত না হওয়া, নিজের স্বাভাবিক স্থৈর্যের ব্যাঘাত না হওয়া, পরাপেক্ষা মোটেই না থাকা, সুবিধে থাকলেও মানুষের কাছ থেকে সুযোগ না নেওয়া, গায়ে পড়ে অপরের পারিবারিক জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার চেষ্টা না করা —এগুলি কত বড় সংযম!

আশুবাবুর বাড়ী ফিরতি হরেন্দ্রকে কমল অভুক্ত ছেড়ে দিল না, তাহলে আশ্রমে গিয়ে তাকে স্বপাক খেতে হবে। রাত অনেক হয়েছিল। হরেন্দ্রকে রেঁধে খাওয়াতে আরও অনেক রাত হয়ে গেল। কমল প্রস্তাব করলে রাত অনেক হয়ে গেল, এখন তো বাসায় যাওয়া হরেনের পক্ষে সুবিধে হবে না—ঐ ঘরেই একটা বিছানা করে দেবে নাকি? "হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানেই শোব, আর তো ঘর নেই। হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল। কমল হাসিয়া বলিল, আপনি তো ব্রহ্মচারী। আপনারও ভয়ের কারণ আছে না কি?

হরেন্দ্র নির্নিমেষ চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব, সে কল্পনা করিতেও পারিল না। স্ত্রীলোক হইয়া এ কথা এ উচ্চারণ করিল কি করিয়া।

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকে ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েছে হরেন-বাবু, আপনি বাসায় যান। তাইতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ী। নির্জন গৃহে অনাত্মীয় নরনারীর একটি মাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন,—পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ, এর বেশি খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছয়নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান্, আর দেরী করবেন না, আশ্রমে যান্। এই বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।”

ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র ব্রহ্মচর্য, সংযম বলতে যা বোঝে, তাতে নরনারীর সম্বন্ধ সকল আবেষ্টনেই এক এবং তা পরস্পর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ থেকে জাত খাদ্যখাদক সম্পর্ক। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে পাওয়া, সুখদুঃখে মেশানো চঞ্চল মুহূর্তগুলি নিয়ে যে জীবনকে কমল স্বীকার করে, সেই জীবন প্রচলিত জীবনের চিন্তাপ্রণালীর সকল বিদ্রূপগ্লানি মাথায় নিয়েও যে

অনেক উপরে—এই কথাটিই এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কমলের বাস্তব যৌন সংযম মহনীয় রূপ নিয়েছে এইখানে। কমল জীবনে ভোগমাত্রকেই পাপ বা রিপু বলে না। সে বলে, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই তার উদ্দেশ্য। ভোগকে সে স্বীকার করে। তবু সে-ই বলতে পারে "পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, আমি তাদের জাত নই।" কেননা তার জীবনদর্শনে নারী পুরুষের ভোগের বস্তুই নয়, তার কামনার ইন্ধন যোগাবার জন্যই নারীর সৃষ্টি হয় নি। তাই তার কাছ থেকেও যেমন কারো ভয় নেই, অন্যকেও সে ভয় করে না। যে ভোগকে কমল স্বীকার করে, জীবনের মধ্যে তার স্থান ও সার্থকতা সম্বন্ধে সে বলছে, "এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা না, প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে—আর না। এর আসল সত্তা তো বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূল্য, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের জোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।"

কিন্তু আশুবাবু ওকে রিপু বলে জানেন, তাকে মানুষের জয় করা চাই। এর উত্তরে কমল বলে, "কিন্তু রিপু বলে গাল দিলেই তো সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাদের কোন্ সত্তাটা কে কবে বিদ্রোহ

করেই ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখকে জয় করা নয়? অথচ ঐ ধরণের যুক্তির জোরেই মানুষ অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়। শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।" জীবনবাদ ও ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের মধ্য দিয়ে এই কথাটিই আমরা বলতে চেয়েছি। প্রকৃতির পাকা দলিলে যারা দখলদার, যাদের সত্তা জীবনের মূলে—তাল সামাল দিতে পারা গেল না বলে—তাদের কোনটাকেই শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পারা যাবে না, যায় নি—ত্যাগকেও না, ভোগকেও না। ও দুটোরই এমন স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংমূল্যত্ব রয়েছে, যা শত অস্বীকৃতির মধ্যেও যুগে যুগে টিকে যাবে। প্রয়োজন ও দুটোর যথাস্থান নির্দেশ করে তাদের মাত্রার পরিমিতি খুঁজে নিয়ে এক ছন্দে গেঁথে দেওয়া—তখনই ওদের প্রত্যেকের কল্যাণ ও অকল্যাণ করার বৃত্তি সংযত হয়ে ওরা সহজ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পায়। একমাত্র তখনই ওদের পেরিয়ে যাওয়া যায়—এ ছাড়া এড়িয়ে গিয়ে মুক্তি নেই।

আজকের দিনে আমরা তাকেই মুক্তি বলি যা বস্তুর স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ। রবির মুক্তি যেমন আলোর মধ্যে, মানুষের মুক্তি তেমনি তার সমগ্র সত্তার সমন্বিত হওয়ার মধ্যে। তা না করে কি ত্যাগ, কি ভোগ, যে কোনটাকেই বর্জন করার চেষ্টা হোক্ না কেন, সে শুধু অক্ষমের মূর্খতার নিষ্ফল প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই হয়

না। জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা দিয়ে ওদের ভাল-মন্দের বিচার; জীবনের অগ্রগমন, জীবনের আবেষ্টনিক নির্দ্বন্দ্ব আত্মাস্বাদন দিয়ে ওদের ফলাফল নির্ধারণ।

কমলের কথার আর জবাব না পেলে অপর পক্ষের শেষ সম্বল ছিল—কমলের বাবা ইউরোপীয়ান, "তাই পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সব চেয়ে বড় বলে জেনেচো।" কমল উত্তর দিলে, "কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় কোরে নিয়ে কোন জাত কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেল, ভোগও ছুটল। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম তো আর জগৎ ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা কোরে কারও বাঁচবার জো নেই।" কাজেই কমলের ভোগবাদ অর্থহীন কামুকতা নয়—এবং ভোগকে যে সার্থক করে ত্যাগই, এ সম্বন্ধেও সে সচেতন। তার ভোগ জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে বিধৃত।

তাই তো চা বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গীর ঘরসংসার গুছাতে গিয়ে দশ-বারোদিন সেখানে কাটিয়ে দিতে তার মনেও যেমন কোন প্রশ্ন উঠে না, আজ যারা তাকে বুঝতে পেরেছে, তাদের মনেও আর কোন প্রশ্ন আসে না। নীলিমার পীড়িত অন্তরাত্মা কমলকে সহজে বুঝতে পেরেছিল, তাই সে বলছে, "ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজা না ভেজার প্রশ্নই ওঠে না।" উৎপাতের ভয়ে রাজেনকে যখন

কেউ জায়গা দিতে সাহস পেলে না, কমল তাকে আদর করে তার ঘরে ডেকে আনলে। "কারো মতামতের মুখ চেয়ে নিজের কর্তব্যে বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না, ও তা-ই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হল সবাই যেন ওর থেকে খাট হয়ে গেছে।" সে সংযমী, তাই সে এ পারলে।

অজিতের সঙ্গে যখন ওর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তখনই কমল অজিতকে বলেছে, "পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, আমি তাদের জাত নই।" কত বড় সংযম! অজিতের সঙ্গে সেই রাত্রিটির আলাপে কমল যে আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছে, তা সহজলভ্য নয়। বিধবা কমল শিবনাথকে বিয়ে করতে পারে, শিবনাথ চলে গেলে নীরবে জীবনের সেই কঠিন সত্যকে সহজে গ্রহণ করে অসময়ে সূর্য অস্ত গেল বলে নূতন প্রভাতের আশায় বসে থাকতে পারে, আবার একদিন অজিতকে গ্রহণ করতে পারে বলে কমলকে আমরা অসংযমী বলি—এই বহু গ্রহণ যে কোন্‌খানে অবাস্তব, আমরা তা যথাস্থানে দেখবও। তবু একথা মানতেই হবে যে, কমল তার জীবনদর্শনের মধ্যে আশ্চর্য সংযমী। বিহ্বলতা নেই, উচ্ছ্বাস নেই; দৃঢ় সংযত কমল কোথাও প্রাণধর্মের সংযমের সীমাকে অতিক্রম করে নি।

আশুবাবু ও হরেন্দ্র কমলকে শেষদিন বলেছিলেন যে, প্রচলিত সমাজবিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ সে শুধু চরিত্রবল ও

বিবেকবুদ্ধির জোরেই সইতে পারছে। সে কথা শুনে কমলের মনে হয়েছিল যে, সমাজবিধি লঙ্ঘন তো উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও করা যায়। তার জীবনেতিহাস যে অকুণ্ঠ ঋজুতায় কোন অবগুণ্ঠনের প্রয়োজনীয়তা না রেখে নির্ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল—সেইটেই একটা বড় কাজ নয়, যা হরেন্দ্র মনে করছিল। সে বলছে হরেন্দ্রকে, "হুঁকান কাটার গল্প শোনেন নি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেন নি, কিন্তু আমি দেখেছি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলা ধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু।" কমল জানে যে, সত্যি কেবল আমার জানার ওপরেই নির্ভর করে না, জগতের কাছে তার প্রমাণ চাই।

তাই কমলের চলন দেখে একথা মানতেই হবে যে, তা উচ্ছৃঙ্খলতার বেহায়াপনা নয়, আর অকুণ্ঠ ঋজুতায় সামনে এসে দাঁড়ানোই তার একমাত্র যোগ্যতাও নয়। তাই তো ভেবে দেখবার দরকার হয়ে পড়ল তার কাজ আর তার কথাগুলির যৌক্তিকতা কোথায়। এ যে কামুকতার ভোগবাদই নয়, এর পেছনে যে নারী জীবনের তথা মনুষ্য জীবনের একটা তত্ত্ব আছে—এ অজিতও ক্রমে বুঝতে পারছে। সে রাত্রিতে কমলকে সে বলছে, "কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে

নেই—তাকে গিলে খাবার মুখ হাঁ করে আছে। লুকানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?" এর পরেই অজিত আবার বলছে, "মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মত তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, তাদের জাত তুমি নও। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখোমুখী বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আসচে। আমাদের নিন্দে সুখ্যাতিকে অবজ্ঞা করবার সাহস যে তুমি কোথায় পাও, তা-ও বুঝতে পারছি।"

শিশুকাল থেকে নারীজীবনের সার্থকতার যে আইডিয়াল আমাদের মাথায় ঢোকান হয়েছে, তাতে লুকিয়ে থেকেই নারীর জীবন কেটে গেল, বাইরে এসেও যে নারী তার স্বধর্ম বজায় রাখতে পারে, এ আমরা জানতে পাই নি। আমরা জীবনে, বিশেষতঃ নারী জীবনে, একটি ঘটনাকেই একান্ত করে দেখতে শিখে-ছিলাম। ভবিষ্যৎ আমাদের অবলুপ্ত, জীবনটা কেবল পিছ-পা চলবার জন্য, যে পিছ-পা চলতে চলতে একে খতম করে দিয়ে একদিন অনন্ত মহাশূন্যে গিয়ে পড়তে পারা যায়। কিন্তু

বাস্তবের পদসঞ্চারণ সামনের দিকে, পেছনে নয়। তাই অসময়ে বেহিসেবে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তবে সেই দুর্ঘটনাই একমাত্র সত্য হবে—এ স্বীকার করাই যায় না। তাই কমল স্বচ্ছগতি বহুঘটনাময় জীবনকে স্বীকার করে। কিন্তু তার চলার একটা ধারা, একটা সংযম, একটা রীতি আছে। তাই ঘটনাবৈচিত্র্যের সমস্ত ব্যথা নিয়েও—সে ঘটনা-বৈচিত্র্য কি তার বৈধব্যে, কি তার দারিদ্র্যে, কি আশুবাবুর পাণীকে প্রত্যাখানে, কি শিবনাথের চলে যাওয়ায়, কি অজিতের সঙ্গে নিভৃত আলাপে—সে যখন সামনের দিকে চলতে চলতে যায়, তখন সকল অবস্থাকেই সে সমান নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্বিশঙ্ক তিতিক্ষা দিয়ে গ্রহণ করে।

তাই সে যখন বলে, "অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য অস্ত গেছে বলে 'সেই' অন্ধকারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতে আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বলবো এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করেই কি সাঙ্গ করে দেবো"—তখন সে খুব স্বাভাবিক হয়। আশুবাবু তাঁর স্বভাবগত চিন্তায় অমনি প্রশ্ন করেন, "রাত্রি তো কেবল একটি মাত্রই নয়, প্রভাতের আলো শেষ কোরে সে-তো আবার ফিরে আসতে পারে?" তখন প্রাণ-দর্শনের স্বাভাবিক উত্তর হচ্ছে, "আসুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন কোরবো।" সহজ সংযমের এই তো পরিচয়। "আর একজন কেউ আর

একজনের জীবনে বিফল হলো বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে”—এ কেমন ?

যে ব্রহ্মচর্য নরনারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই জানে, জীবনে তথাকথিত ঐকদেশিক ত্যাগ, সংযম, নিষ্ঠাকে সেই ব্রহ্মচর্যই স্বীকার করে নিয়ে নারীবর্জনের ব্যবস্থা দিয়েছিল। সেই ব্রহ্মচারীরাই তো নারীকে ভোগের বস্তু করে তুলেছে ; তাদের কাছেই নারী “দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী।” কিন্তু এই কি নারীর সত্যিকার পরিচয় ? সত্যকে তার এক অর্ধেকে স্বীকার করার ফলেই তার অপরার্ধ এমন ভয়াবহ মূর্তিতে দেখা দিল। জগৎটাকে এরা যখন শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষ করলে, তখন একে যে রকম বলে মনে করলে, জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবে যখন নেমে এল, তখন দেখতে পেলে যে সে ঐরকমই নয় বটে। নারীকে তার স্বাতন্ত্র্যে সত্য বলে স্বীকার না করার ফলেই তো নারী পুরুষের ভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষতন্ত্র সমাজব্যবস্থায় নারী তো একমাত্র ভোগ্য হয়েই আছে। তাই তো পুরুষের গড়া সমাজে নারী পেল না তার যোগ্য আসন। নারীকে পরতন্ত্র করে রেখেই পুরুষ তার স্থান ও মর্যাদা নির্দেশ করেছে, শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা দিয়েছে। ব্যবস্থার মূলেই তাকে পরতন্ত্র করে রেখেছিল বলেই নারীর নির্দিষ্ট মর্যাদা, শিক্ষাদীক্ষা সবই ভেসে যেতে পেরেছে, আর তাই পুরুষ ক্রমেই শোষক হয়ে উঠতে পারল। স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ, স্বাধীন স্বতন্ত্র নারী—গোড়ায় এইটে স্বীকার করে

নিয়ে তারপরে দু'জনের মিলন হলেই সেটা হয় সার্থক ও সুস্থ মিলন; সেখানে আস্বাদনের ক্ষেত্রে কখনও একজন ভোক্তা, অপরজন ভোগ্য; আবার উল্টে নিয়ে কখনও ভোক্তা ভোগ্য, ভোগ্য ভোক্তা। এক তরফা ভোগ্য হয়ে থাকার জন্য নারী সৃষ্ট হয় নি—একথা গোড়ায় মানতে না পারলে অত্যাচার শোষণ কোন মতেই বন্ধ করা যাবে না।

এই পুরুষকৌলীন্যময় সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নীলিমা। এই নীলিমাকে আজ এরা পরম শ্রদ্ধা করে তার পরসেবাপরায়ণতার জন্য; কিন্তু বিপদের দিনে তার জন্য কোন দিকের পথই খোলা পাওয়া যায় না, ঘরেপারে তার স্থান হয় না কোথাও। তাই তো পরম বেদনায় তাকে বলতে হয়েছে, "...বাংলা দেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবো না;......কিন্তু তারপরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাই নে।" কমলকে বলছে, "ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বলব, না পাই মরবো। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জনার মত আর ঘাটে-ঘাটে ঠেকতে-ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না।"

পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে চলা ছাড়া নারীর নিজস্ব স্বতন্ত্র কোন ঠাঁই নেই। কেননা এদেশের সমাজব্যবস্থায় নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন—কারো অধীন

না হয়ে থাকা ছাড়া এ সমাজব্যবস্থায় নারীর আর গত্যন্তর নেই। একটি পুরুষের হাতে তার রক্ষার ভার থাকতেই হবে। এইখানে তো মেয়েরা মরে রয়েছে। পুরুষের সঙ্গে নারীর যুক্ত হওয়া অপরিহার্য, নারীর সঙ্গে পুরুষের যুক্ত হওয়াও অপরিহার্য—এ সংসারে ঐটেই তো জীবন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে যুক্ততা নারীকে নরের মধ্যে নিঃশেষে মুছে দিয়ে কেন? স্বাধীন স্বতন্ত্র এক সত্তার সঙ্গে স্বাধীন স্বতন্ত্র অপর সত্তার মিলন-কল্পনা কেন অবাস্তব? নিঃশেষে মুছে গিয়ে যেখানে আবার স্বতন্ত্রতা ফিরে পাওয়া যায় না, সেখানে তেমন ভাবে মুছে যেতে আজ আর মেয়েরা রাজী নয়। ব্যবস্থা এমনই হোক্ যেখানে পরস্পর পরস্পরের মাঝে মুছে গিয়েও স্ব-তন্ত্র। প্রত্যেকের যথা ক্ষেত্রে প্রত্যেকের যোগ্যতা দিয়েই তার মর্যাদা। সে যোগ্যতার মানদণ্ড কেবল পুরুষই নয়। নীলিমা বলেছে, "পুরুষের তৈরী সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরেছি, কত যে জ্বলেছি, তা জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েছে কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়ে নি।" মেয়েরা আজ কি চায়, কেন চায়, তার একটা দিক কমলের মধ্যে ফুটে উঠল। কিন্তু মেয়েদের অন্তর জ্বালার প্রতিকারের স্বরূপ ও রূপ সে-ই শুধু নয়, সে কথাও মনে রাখতে হবে।

নারীর পক্ষে একতরফা সেবা করাই পরম ধর্ম ছিল বলে চা-বাগানের হরিশবাবুর বোন যখন বিধবা হলো, তখন

হরিশবাবু তার একপাল ছেলেমেয়েকে বোনের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন, তোর ভাবনা কি, এদেরই তুই মানুষ করে তোল, এদেরই তুই মায়ের মত···ইত্যাদি। সেবা করাই মেয়েদের প্রয়োজন—তা যে কাউকেই হোক্ না কেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষ এ কথাটা ভেবে দেখলে না যে, পরের সেবা করাও যেমন জীবনের পক্ষে সত্য ধর্ম, তেমনি এমন কাউকে দরকার যাকে নিজের বলে সেবা করা চলে। সেই সঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, সেবা করবার বৃত্তি যেমন সনাতন, সেবা পাওয়ার বৃত্তিও তা-ই বটে। এবং নরনারী উভয়ের পক্ষেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে সে কথা স্বীকার করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হয় নি। মেয়েরা চিরদিন একতরফা সেবা করেই আসবে, সেবা করে যাওয়াই তাদের ধর্ম—এই ব্যবস্থাই হয়েছিল। মনস্তত্ত্বের রসধর্মের এ সহজ সত্যটি বুদ্ধিমান শাস্ত্রকারেরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, পুরুষের পক্ষেও সেবা পাওয়া যেমন একটি সত্য বৃত্তি, সেবা করাও তার সত্তার অপরিহার্য সত্য কথা। কিন্তু নিজের সেবা করার বৃত্তিকে চরিতার্থ করবার কোন অবকাশ সে তার সমাজব্যবস্থায় রাখে নি। এজন্য সমস্ত সমাজকে—নারী-পুরুষ উভয়ের দিক থেকেই—যে মূল্য আজ দিতে হচ্ছে, তা যেমন যথেষ্ট, তেমনি বীভৎস।

একতরফা পুরুষ-কৌলীন্যের প্রতিক্রিয়ার একটি জ্বলন্ত

দৃষ্টান্ত অক্ষয়। কাহিনীর প্রথমে অক্ষয় যে-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল—সেই পরিবর্তনটুকু অনুধাবন করলে মনস্তত্ত্বের কোন্ ইঙ্গিত ফুটে উঠছে? অক্ষয় যে-সমাজব্যবস্থার একান্ত সমর্থক, সে সমাজ নারীকে পুরুষের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। শুধু সেবা পাওয়ার মধ্য দিয়ে যে পুরুষেরই আর একটা দিক—সেবা করার দিক—উপোস থেকে যায়, স্ত্রীকে সারা-জীবন পাদোদক দিয়ে, তার ইহকাল পরকালের দেবতা হয়েই যে পুরুষের সামগ্রিক সত্তার আস্বাদন তৃপ্ত হয় না, স্ত্রীকে সেবা করবারও যে সমপ্রয়োজন আছে, এতদিনকার বুদ্ধিমানদের রচিত একতরফা সমাজব্যবস্থা এইবার তার প্রমাণ পাচ্ছে। যে স্ত্রীকে বিয়ে করে ন'বছরে ঘরে এনেছিল, স্বামীকেই যে ইহ-পরকালের দেবতা বলে জেনে এসেছে, দীর্ঘকাল ধরে এ হেন স্ত্রীর স্বামী হয়েও সেই খাঁটি অক্ষয়কে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়েছিল, "বোধ হয় তাই, (অর্থাৎ স্ত্রীভাগ্যে ভাগ্যবান)—ঠিক জানিনে। হয়ত, একেই স্ত্রীভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা।"

কমলের স্বাতন্ত্র্য-বোধের মর্যাদা তাই তো অক্ষয়কে তাকে শেষ পর্যন্ত আপনি বলে সম্বোধন করতে বাধ্য করেছিল। নারীকে এই স্বাতন্ত্র্যের শ্রদ্ধা তো অক্ষয়

কোনদিন করতে জানে নি, অথচ শ্রদ্ধা করতে চাওয়া যে সকল মানুষেরই পক্ষে একটি চিরন্তন ধর্ম। কমলের স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল মূর্তিকে তাইতো সে শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা না করে পারে নি। তার এতদিনকার উপবাসী সত্তা তাই আজ এ কথা না বলে পারলে না, "একটা অনুরোধ কোরব? যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন?" এতদিন যে শুধু পেয়ে এসেছে ও নিয়ে এসেছে, দেবার জন্য আজ তার সমগ্র সত্তা উৎপীড়িত হয়ে উঠবে—মনস্তত্ত্বের এই সহজ সত্যটির কাছে এতদিনকার সমাজব্যবস্থা ধরা পড়ে গেছে। তাইতো প্রতিক্রিয়ায় আজ উল্‌টে গেছে হাওয়া। তথাপি ইংরেজের আইনে সতীদাহের বাইরের আগুনটা নিবেছে বটে, কিন্তু নানা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজদেহে আজও তা সমানভাবেই জ্বলছে; স্কুল কলেজ সিনেমায় যাওয়ার স্বাধীনতায়, অর্থনৈতিক চাপে পড়ে চাকুরী গ্রহণের স্বাধীনতায় সে কথাটা পুরুষের কাছে এমন কি নারীরও কাছে আজও বোধহয় চাপা পড়েই রইল। তাই স্কুল কলেজে বই মুখস্থ করে ডিগ্রী অনেক লাভ করলেও মেয়েদের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের সচেতনতা ও স্বাধীন মনোবৃত্তি জন্মলাভ করতে পেল না।

যাই হোক্, এই পুরুষকেন্দ্র একতরফা সমাজব্যবস্থারই নারীর নিপীড়নের দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে নীলিমা, আর কুলীন পুরুষকে শেষ মনস্তত্ত্বের কোন খোঁচার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়, তাই স্পষ্ট করে তুললো অক্ষয়।

অতীত ভারতের সনাতন সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রের সম্পর্কে কমলের কাছ থেকে নরনারীর সম্পর্কের বক্তব্যটি শুনে কমলের এই কথাটিই আমাদের মনে পড়ে যে, "নরনারীর ভালোবাসার ইতিহাসটাই হচ্ছে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল সব চেয়ে বেশি, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের শুধু অপমান কোরেই ক্ষান্ত হয় নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং এই অসত্যের পরেই ভিত পুতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হোলো না।" ভার্যার প্রয়োজন যখন শুধু পুত্রের জন্য স্থিরীকৃত হল, তখন মেয়েদের স্বতন্ত্র কোন মূল্যই রইল না; তাদের নিজেদের "জন্য"টা গেল বাদ পড়ে। ভার্যার জন্যও যে ভার্যার প্রয়োজন, এ প্রথম সত্যটি গেল অপর একটি বিশেষ "জন্য"র জন্য মুছে, জীবনের সামগ্রিক সত্তা গেল হারিয়ে। "চাটু-বাক্যের নানা অলংকার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী-জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল।" এই একটি বিশেষ "জন্য"র জন্যই হয়ে পড়ার দরুণ নারী সমাজে ভোগ্য হয়ে উঠতে পেল। মাতৃত্বকেই একমাত্র স্বীকার করার ফলে নারীর রমণীত্ব পড়েছিল চাপা। কিন্তু নারী পুরুষ উভয়েরই ভেতরের অন্য কথাগুলি তো মুছে যায় নি। প্রকাশের সহজ পথ না পেয়ে তাইতো নারী মোহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাকে প্রাণ খুলে

স্বীকার করা হয় নি, স্বীকৃত হওয়ার জন্য সে মনস্তত্ত্বের উপর যে চাপ দিচ্ছিল, তা-ই নারীকে ভোগের বস্তু করে তুলেছে।

এইখানে আমাদের মনে পড়ছে সেই বৃষ্টির আকাশের ঘনান্ধকারের মধ্যে যেদিন আশুবাবু হরেন্দ্র অজিত নীলিমা বেলাতে মিলে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই দিনকার গল্পগুলি।

একটি গল্প এইরকম। মেয়েটিকে একদিন ভালবেসেছিল অনেকে। তাদের একজন আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছিল, আর একজন সাগরপারে চলে গিয়েছিল। দীর্ঘ পনের বৎসর পরে একদিন দেখা। যাকে দীর্ঘ দিন ধরে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উন্মত্ত কামনা দিয়ে আকাজ্ক্ষা করে এসেছে, পনের বৎসর পরে তাকে দেখামাত্র সব যেন ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। মেয়েটিই এতদিন ইচ্ছে করে এসেছে যে, ভগবান যেন নিস্ফল প্রেমাকাজ্ক্ষা থেকে ছেলেটিকে মুক্তি দেন। কিন্তু সে মুক্তি সত্যই যখন এল, যখন মেয়েটির অবসিতপ্রায় যৌবনের দিকে চেয়ে সত্যিই ছেলেটির সমস্ত মন বিরূপ হয়ে গেল —তখন চিত্তদাহে মেয়েটির অন্তর জ্বলে গেল। নিজেকে বিশ্বের মধ্যে আস্বাদিত করবার আকাজ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। পুরুষের ভালোবাসায় প্রত্যক্ষভাবে সাড়া না দিয়েও যে সে তার আস্বাদিত হওয়ার আকাজ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করে আসছিল, একথা নিজেও সে আগে জানতো না। উপলব্ধি করলো তখন, যখন পুরুষের দিক থেকে এল বিমুখতা। দেহের যৌবন যখন

ফুরিয়ে গেছে বলে সে জানতে পেলে, তখন নিজের আস্বাদিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেও নিজেকে সে মুক্ত করে ফেলতে চাইলে। বললে, "যে রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে শেষ হয় নি বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।" যৌবন যদি গেছেই, তবে সে যাওয়াকে স্বীকার করে নিয়ে মেয়েটি অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কিন্তু মা হবার শক্তিটুকুই একমাত্র যৌবন নয়।

অন্য গল্পটি এইরকম। আটাশ উনত্রিশের এক ইংরেজ যুবক একটি পোলিশ রমণীকে ভালবেসেছে—ভালবাসা যখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ, বিয়েও ঠিক, তখন একদিন জানা গেল মেয়েটির বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে। মেয়েটির চেহারা বা ব্যবহার এতই যৌবনপ্রদীপ্ত ছিল যে, এত মেলা-মেশার মধ্যেও তার বয়সের কথা জিজ্ঞেস করার কথা কারোরই মনে আসে নি। জিজ্ঞেস করলে সে নিশ্চয় লুকাতো না, সে জাতের মেয়েই সে নয়। কিন্তু বয়সের কথা শোনামাত্র ছেলেটির সমস্ত মন এমন বিমুখ হয়ে উঠল যে, কিছুতেই, কোন আবেদন নিবেদনেই আর কোন ফল হলো না।

ভারতবর্ষে আমরা জেনে এসেছিলাম যে মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা। তার প্রতিবাদ আনল কমল। বললে, রমণীত্বেই নারীর সার্থকতা। এরই ইঙ্গিত পাচ্ছি গল্প দুটোতে।

যৌবনই তাদের পক্ষে বড় কথা। একদিন যেদিন এরা নারী ছিল, সেদিনের সেই বিগত যৌবনটুকু এদের দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু তাদের এই যৌবন এত সহজে শেষ হয়ে গেল বলে তারা মনে করতো না, যদি তারা চিরযৌবনত্বের, স্থিরযৌবনত্বের খোঁজ পেত। চিরযৌবনত্ব মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ। দুটি অংশ সত্তা মিলে গিয়ে এক হওয়ার যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, সেই হওয়া যৌবনের মধ্যেই সম্ভব ও বাস্তব।

এই যৌবনের দুটো দিক—রমণীত্ব ও জননীত্ব। যৌবন নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে ব্যয়িত করেও অব্যয় অক্ষয় থেকে যাবার সামর্থ্য রাখে, কেননা তার বাইরেও তার একটা স্বয়ংমর্যাদা ও স্বয়ংমূল্যপূর্ণ স্থান আছে। এই বিশ্বসৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে নিজের অনেক ক্ষয় করে দিচ্ছে, তবু তার নিত্য নূতনত্বের, পরিপূর্ণ যৌবনত্বের এতটুকু হ্রাস পেল না—নিজেকে অনন্ত ব্যয় করেও সে অব্যয় থেকেই যাচ্ছে। তেমনি মানুষের পক্ষেও।

এ দুটোর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। যে যৌবন সৃষ্টি করতে পারে না, সে ক্লীব; যে যৌবন সৃষ্টি করতে গিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়, সে ব্যর্থ, সে জঞ্জাল। পরিপূর্ণ নারীত্বের পক্ষে মাতৃত্ব ও রমণীত্ব দুইই অপরিহার্য, তেমনি পরিপূর্ণ নরত্বের পক্ষেও তার পিতৃত্ব ও রমণত্ব দুইই। যৌবন এ দুটোকে মিলিয়েই সার্থক ও সুন্দর। স্রষ্টার দৃষ্টিতে যা সৃষ্টি, যা পিতৃত্ব,

মাতৃত্ব—স্রষ্টাদের পক্ষে তা-ই রমণীত্ব ও রমণত্ব। তাই সমগ্রের বাস্তব দৃষ্টিতে সৃষ্টি করে চলতে চলতেই যৌবন ঘন হতে ঘনতর হয়ে ওঠে, ওর কোন একটিকে বাদ দিয়েই সে সার্থক নয়।

অজিত বলছিল কমলকে, কি দিয়ে সে বেঁধে রাখবে তাকে, কই তার সে জোর? কিন্তু বাঁধতে যে সে চায়।—বাঁধতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যে মনোবৃত্তি নিয়ে অজিত বিবাহের অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করছিল, আমরা সেই রকম করেই বেঁধে রাখবার জন্য বিবাহ স্বীকার করতে পারি না। জীবনের যা অপর দিক,—সেই হৃদয়ধর্মের সচল স্বাধীনতার দিক—তাকে স্বীকার করে নিয়েই বিবাহের বন্ধনকে আমরা স্বীকার করি। সমাজের মধ্যে মিলিত জীবন যাপন করে একটি সভ্যতা রচনা করতে চাইলে বিবাহের প্রয়োজন আছে। সে বিবাহ সহজ জীবনের দ্বিধা বিভাগকে স্বতন্ত্র মূল্যে স্বীকার করেই। নরনারীর সম্পর্ক যখন সহজ জীবনের পটভূমিকায় শুদ্ধ প্রীতির ওপর দাঁড়াবে, যেখানে বুদ্ধির স্থিতির বন্ধন ও হৃদয়ের গতির স্বাধীনতা মিলে গেছে, সেখানে তখনই তা সুন্দর, মহান। নয়তো বাইরের থেকে নিয়ম-নিষেধ আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজালে পরস্পরকে বেঁধে রাখতে হলে সে যেমন জীবনের পক্ষে উৎসব হয় না, তেমনি হয় না সে মানুষের পক্ষে সম্মানেরও। দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তার পারস্পরিক মিলনই তো সত্যিকারের

মিলন। বাইরের কৃত্রিম বন্ধন, কৃত্রিম আচার, নিয়মনিষেধ যত কম থাকবে, মানুষ ততই সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবে।

কিন্তু একথা মনে করতে আজ আমাদের মোটেই সুবিধে লাগবে না যদি না আমরা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি খুঁজে পাই। বর্তমান সমাজ যে প্রচলিত শাস্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাতে আজ এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু মানুষ যেহেতু চলে এবং সেই সঙ্গে ধর্মসমাজরাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে তার সভ্যতাও যেহেতু চলবে—যত মৃদুমন্দ গতিই তার হোক্ না কেন, থাক্ না এমন দৃষ্টান্ত যে একটি স্থিতিপ্রধান সভ্যতা ভারতের বুকে দুই হাজার, আড়াই হাজার বৎসর পর্যন্ত টিকে গেছে—সেই হেতু এমন দিন আসবে যেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের—স্বামীস্ত্রী, পিতাপুত্র সমস্ত সম্পর্কেই—পারস্পরিক সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে থাকবে পারস্পরিক স্বতন্ত্র স্বাধীন যোগ্যতার উপর।

এইখানে মনে উঠতে পারে যে আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম নিষেধ কি তাহলে থাক্‌বে না একেবারেই? আচার অনুষ্ঠান, নিয়ম নিষেধ থাকবে নিশ্চয়ই। আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসই বাইরে আকারিত হয়ে ওঠে; রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন মেয়েলি চেষ্টা, কেননা "দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তমাংসে।" প্রাণের কথা রূপ পেতে হলে বাইরে কোন না কোন আচার অনুষ্ঠান থাকবেই। কেননা জীবনের মধ্যে form ও spirit—আকৃতি ও প্রকৃতি—সমভাবেই সত্য। কিন্তু সে আচার অনুষ্ঠান এমন হবেই না, যা

মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠেললাটে বেঁধে ফেলে, যা মানুষকে অতীতেই আঁকড়ে ধরে রাখে, যা তাকে সামনের দিকে চলতে, নূতন ভবিষ্যতে যেতে বাধা দেয়। মানুষের সহজ স্বাভাবিক প্রকাশকে বাধা দিয়ে যে আচার অনুষ্ঠান টিকে থাকতে চায়, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। পরগাছার মত মূলের থেকে রস আহরণ করে ঐ পরগাছাগুলিই তখন সতেজ হয়ে ওঠে, মূল যায় শুকিয়ে, মরে।

মানুষকে স্বাধীনতা দিলেই মানুষ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই সঙ্গে তার অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠবার অবকাশ পায়। অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ দুইটি স্বতন্ত্র সত্তার বিবাহ প্রয়োজন, যারা অতীতকে বর্তমানের মধ্যে হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে অবন্ধমুখ ভবিষ্যতের পথে। আমরা যে চিন্তা-প্রণালীর বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ হয়েছি, তাতে আজ এর বিকৃতির কথাই বেশী করে মনে পড়বে। কিন্তু আজ যা হচ্ছে, তা-ই বিকৃতি ; একটি সুচিন্তিত লজিকের দার্শনিক পথে জীবনের সহজ ধারাকে স্বীকার করে যদি সভ্যতার মাপকাটি দাঁড় করানো যায় এবং তার জন্য পথের নিশানা দিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেদিন এর বিকৃতি যাবে ঘুচে। আজ আমরা যার মধ্যে আছি এবং যে ভাবে যা হয়েছি, তা কোন সুচিন্তিত পথেরই চলার ফল নয়। আমরা আমাদের অতীত ব্যবস্থাকে হারিয়েছি—কেননা তা তার রূপে অবশ্য পরিত্যাজ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নূতন যুগে নূতনতর আবেষ্টনে জীবনের বিভিন্ন দিকের যে সব কথা আত্মপ্রকাশ করছে, তাদেরকে সত্য বাস্তব

রূপে বিচার করে, মেনে নিয়ে আমরা তার নূতন জীবনদর্শন বের করে নেই নি। জীবনের স্থিতিভূমি নষ্ট হয়ে গিয়ে আজ আমরা ঘরেও নেই, পারেও নেই।

গত্যাত্মক হৃদয়ধর্ম যেমন আপনার মধ্যে আপনি পূর্ণ, যেমন তা সহজ জীবনের অপরিহার্য এক সত্য দিক, যার সহজ চলন দেখান হয়েছে কমলের জীবনে, তেমনি সহজ জীবনের স্বয়ংপূর্ণ অপর দিকটি প্রজ্ঞার, স্থিতির, একের। এই দিকটিই আশুবাবু। ওঁর মধ্যে চঞ্চলতা নেই, মাতামাতি নেই; স্থির অচঞ্চল একনিষ্ঠ মানুষটি। তাজমহলের তলে বহুক্ষণ তর্কালোচনার পর বিদায় নেবার বেলায় আশুবাবুকে লক্ষ্য করে শিবনাথ বলছে শিবানীকে, "তর্কই শুধু করলে শিবানী, শিখলে না কিছুই।" বিস্মিত কমলের শেখবার কোথায় কি ছিল মনে পড়ল না দেখে শিবনাথ মন্তব্য করলে, "পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইলো। পারো যদি আশুবাবুর জড়াগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই।" একেবারে প্রথমেই অবহিত হতে না পারলেও দিনকয় পরে শান্ত গম্ভীর সহজ সরল আলাপচারী মানুষটির কথা কমল বলছে, "কিন্তু আমার চেয়েও পরম বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি। ধৈর্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও পৌঁছয় না।"

জীবনের এই যে শান্ত সমাহিত আত্মতৃপ্তি, এ আশুবাবু লাভ করেছেন একত্বের, অতীতের, প্রজ্ঞার একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা। জীবনের বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে সরল একত্বের একনিষ্ঠ পূজা মানুষকে যে দৃঢ় প্রত্যয়, যে শান্ত গাম্ভীর্যের অধিকারী করে, তা মানুষকে অনেক মূল্যে লাভ করতে হয়। সংসারের বহু বিষয় থেকে চিত্তকে সরিয়ে এনে পথযাত্রাকে আশুবাবু সরল করে এনেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ জীবনটা এখানেই শেষ নয়, জন্মান্তর কালেও এর ফলাফল লাভ হয়। তাই যে-পত্নী যৌবনে লোকান্তরিত, তাঁর প্রতি আশুবাবুর নিষ্ঠা এতটুকু ম্লান হয় নি, কালের দাগ তাতে এতটুকু লাগতে পায় নি। একত্বের দৃঢ় খুঁটিতে বাঁধা তাঁর মন সম্মুখের অজানা ভবিষ্যতের ধার ধারে না; তাই তাঁর ভয় নেই, চাঞ্চল্য নেই। তিনি জানেন আজকের ভারতকে তার দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে হলে সেই অতীত দিনের ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, যা জগদতীত এক-ব্রহ্মের ধ্যানের জন্য তৈরী হয়েছিল, তাদেরই শরণ নিতে হবে। তাই হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আয়োজন ও প্রয়োজন আশুবাবুর ভাল লেগেছে। "আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্যম"—এরই আজ প্রয়োজন। তাঁর মতে "আমাদের সমাজকে যারা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না। ছিলেন সন্ন্যাসী, তাঁদের দান নিঃসংশয়ে নতশিরে মেনে নিতে পারলেই হল আমাদের চরম সার্থকতা, এই আমাদের কল্যাণের পথ, এ ছাড়া আর পথ নেই।"

একত্বের প্রতি এই দৃঢ়নিষ্ঠা মানুষকে বহু দুঃখ যন্ত্রণা বিপদের থেকে মুক্তি দেয়। কেননা সে অতীতের মধ্যে তার খুঁটি গাড়ে ভবিষ্যতের অজানার দুয়ার বন্ধ করে দিয়ে; বস্তু বা ঘটনার কার্যকারণশৃঙ্খলাকে সে একটি ধরাবাঁধা নিয়ম বলেই মেনে নেয়। অতীতকে তো জানাই আছে, তাকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রাখাই শুধু সাধনা। "The Scientific mind thinking causally, is incapable of understanding what is ahead, it only understands what is past, i. e. retrospective.".— C. G. Jung.

এই অতীতের প্রতি, একত্বের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। মানুষ যদি কেবল সম্মুখের দিকে চেয়েই চল্‌তে চায়, অতীতকে একেবারেই অস্বীকার করে, তবে সে দাঁড়াবে কিসের উপর? একত্বের প্রতি এই দৃঢ়নিষ্ঠা মানুষকে যে একটি ভিত্তি দান করে, সে ভিত্তি না থাকলে মানুষ ছিট্‌কে কোথায় পড়ে যেত, তার ঠিকানা মিলতো না। তাই তো মানুষ শত দুঃখেও বাপদাদার ভিটে ত্যাগ করে না। অন্ততঃ দাঁড়িয়ে থাকবার ঐ ভিটে ত্যাগ করে এলে বাইরে যে একেবারে অজানার রাজ্যে এসে পড়তে হবে; সেখানে অনন্ত আকাশের অনন্ত অবকাশের নীচে সে যে একেবারে একলা, কে তাকে রক্ষা করবে? কে তাকে আগলে রাখবে ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি বজ্রপাতের থেকে? মানুষকে বাঁচতে হলে এই স্থিতি তার পক্ষে অপরিহার্য। একের

প্রতি নিষ্ঠা, একের প্রতি নির্ভর, একের নিকট আশ্রয় লাভ—মানুষের অন্তরের এ একটি সত্য বাস্তব দিক, যাকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করে চলা সম্ভব নয়। বহুর আস্বাদন, বৈচিত্র্যের লীলা মানুষকে শ্রান্ত করে, ক্লান্ত করে; তাই একের প্রতি নিষ্ঠা, একের নিকট নিঃসংশয় আত্মদান মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মানুষের দেহমনের এমন একটি আস্বাদন আছে, যা একত্বের অতলে অবগাহন করে সার্থক।

সেখানে সে বুদ্ধির বিবেচনা দিয়ে তৈরী পথে হাঁটে। যা ছিল, যা আছে, তাকেই লাভ করতে, আয়ত্ত করতে, ধরে রাখতে তার প্রাণপণ যত্ন। তাইতো আঘাতের পর আঘাত যখন বৃদ্ধ আশুবাবুকে জর্জরিত করে তোলে, তখন তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা পত্নীর স্মৃতি, যা জীবনভর তাঁকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে। তাই কাহিনীর শেষের দিকে নীলিমার কথা জানতে পেরে নূতন সত্যকে যখন তিনি উপলব্ধি করলেন, তখনও তাকে দুয়ার থেকেই নমস্কার করে বিদায় দিলেন। একনিষ্ঠ প্রেমকে কোনদিন তিনি সন্দেহ করেন নি, আজও করতে পারবেন না। কমলকে বললেন, "ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকে নি, আজও সে ছেড়ে থাকবে না। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।"

কমলের মতে লোকান্তরিতা পত্নীকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছ থেকে পাবারও কিছু নেই, তিনি নেই। কিন্তু

তাই কি সত্যি ? একেবারেই তিনি নেই, এ কি সম্ভব ? তিনি নেই, তবু তিনি আছেনও। আশুবাবুর কাছে সেইটুকু থাকাই একমাত্র হয়ে আছে। "দাম্পত্যজীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্বিঘ্ন শান্ত ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটিয়াছে", তাদের পক্ষে অতীতকে আশ্রয় করা ছাড়া সহজ পথ আর নেই-ই।

বর্তমানটি তো আকাশ থেকে পড়ে নি, সে গড়ে উঠেছে অতীতেরই ক্রমায়নের পথে, তাকে একেবারে অস্বীকার করে যে সে দাঁড়াতেই পারে না। মানুষের মধ্যের এই যে পিছটান,—এর সত্য বাস্তবতাকে কিছুতেই একেবারে খতম করে দেওয়া যাবে না, সামনে চলার আহ্বান তার পক্ষে যত সত্যই হোক্ না কেন। বিচিত্র এই মানব সত্তা—এর একদিকে আছে সামনে চলার তীব্র সংবেগ আর সেই সঙ্গেই আছে অতীতকে ধরে থাকবার দৃঢ়মুষ্টির বজ্রচাপ, শত সম্মুখ আহ্বানও যাকে খুলে ফেলতে পারে না। নদী যতই চলতে চলতে সরতে সরতে যাক্ না কেন, ঢেউ-বৈচিত্র্যের সমস্ত আনন্দ ও ব্যথা নিয়ে তাকে দুই তীরের বন্ধনকেও স্বীকার করতে হয়, সমস্ত চলার মধ্যেও নদী-আমির অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে। সমস্ত দিনের চলার পর ঘরের কোণের স্বল্প বিশ্রামটুকু অপরিহার্য সত্য ও বাস্তব প্রয়োজন। সৌর জগতে যে গ্রহগুলি ছুটে চলেছে অবিশ্রাম গতিতে,

পারস্পরিক টানের মধ্যে তাদেরও একটা কেন্দ্র আছে, যা না হলে তাদের অস্তিত্ব কেউ কোনদিন খুঁজে পেত না। আশুবাবুর জীবনে দেখি সেই কেন্দ্র, সেই স্থিতি। চলার গান যতই গাও না কেন, বসবার কথাও বলতেই হবে, নয়তো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে। তাই তো আশুবাবু অপর পক্ষের কথা অনেক শুনেও না বলে পারেন না যে, তাঁর বিরুদ্ধে যত কথাই থাক্ না কেন তবু তাঁর কথাগুলিকেও একেবারে ঠেলে ফেলার নয়। সেগুলির মধ্যেও একটা যাথার্থ্য আছে, বক্তব্য আছে, সত্যতা আছে। কমলকে তিনি তাঁর বক্তব্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি বটে কিন্তু কিছুতেই নিজের দেখাকে ত্যাগও করতে পারেন নি।

জীবনের পক্ষে আশুবাবু অপরিহার্য, কমলও অপরিত্যাজ্য। দুজনে চাঁদের এ পিঠ ও ওপিঠ। আশুবাবু একনিষ্ঠার সেবক, কমলের কাছে নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা নয়, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে এসেছে, সে-ও তার প্রাপ্য নয় ;—মোটাকথায় সে বহুনিষ্ঠ। আশুবাবুর মতে আমাদের বাঁচবার পথ, অতীতের সংযম ব্রহ্মচর্যেই রয়ে গেছে, তাকে নত শিরে মেনে নেওয়ায়ই আমাদের কল্যাণ, তাছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। কমলের কাছে কেবল অতীত বলেই বস্তু পূজ্য হয়ে ওঠে না, তাকে ভাল হতে হয় নিজের গুণে। বিগত দিনের দর্শন দিয়ে যদি বর্তমানের বিধিবিধান সমর্থন করা না-ই

চলে, না-ই বা চললো ; অতীত বলেই তাতে এত মমতা কেন ? বর্তমানকালে ওতে মঙ্গল হবে কিনা বিবেচ্য সেইটেই। অতএব দেখা যাচ্ছে কমল আর আশুবাবু দুজনে একেবারে উল্‌টো। তাহলে দুজনে কি একেবারেই বিপরীত ? তাঁরা কি কেবল বিরুদ্ধ পক্ষ ? অথচ তাঁরা দুজনে দুজনকে ভালবাসছেন।

তাজমহলের নীচে তার চেয়েও পরম বিস্ময় একটি ছিল, সে আর একটি দিক, সে আশুবাবু,—এ মন্তব্য অজিতের কাছে কমল করেছে। অন্যত্র সে বলেছে দুইদিনমাত্র সে আশুবাবুকে দেখেছে, এরই মধ্যে তাঁকে সে ভালবেসেছে। অজিত বলছে আশুবাবুকে, "আশ্চর্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বিরোধ ; অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশি।" সত্যিই তো, কমল আর আশুবাবু দুজনে ঠিক বিপরীত—এঁরা পরস্পরকে ভাল-বাসবেন এমন হতেই পারে না। সোজা লজিকে উচিত ছিল ওঁদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলেই ওঁরা লাঠালাঠি করবেন—সাধারণতঃ সংসারে যা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে প্রথম দিনই আশুবাবু কমলকে ভালবেসেছেন, কমলও আশুবাবুকে ভালবেসেছে।

কেন এমন হল ? তার কারণ, সোজা যে লজিকটা দেখা যায় তার পরেও লজিক আছে। প্রথম কথা, কমলের যা মত, তা তার জীবনের মধ্যে রূপ লাভ করেছে, আশুবাবুর

চিন্তাধারাও রয়েছে তাঁর প্রজ্ঞা-সহজ জীবনে। কারো মধ্যেই চিন্তার সঙ্গে জীবনের আচরণে কাপট্য নেই, ভাবের ঘরে চুরিও নেই। তাঁরা জীবনকে ভালবাসতেন বলেই পরস্পরকে ভালবাসতে পেরেছেন, পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছেন। দ্বিতীয়তঃ, পরস্পর-বিরুদ্ধ মত দুটির মধ্যে একান্ত বিরুদ্ধতাই তো নেই, তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক পরিপূরকতাও রয়েছে। একের অভাব অন্যে পূরণ করে তারা একটি পূর্ণ অখণ্ড সত্যের দুই দিক। তাই আশুবাবুকমল পরস্পরকে আকর্ষণ করেছেন, যেমন পজেটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎকণা পরস্পর-বিরুদ্ধ হয়েও পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কমল একস্থানে ব্যথার সঙ্গে বলেছে "আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।" এর উত্তর দিল নীলিমা। সে বললে, "আছে বৈ কি কমল। কিন্তু সে তো মনিবের ফরমাস মতো কাটা ছাঁটা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরার মধ্য দিয়ে বয়। তাই, বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক্, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।" এ মিল ছন্দের মিল, জীবনের মিল। তাঁদের এই পারস্পরিক প্রীতি কি ইঙ্গিত করছে ?—উভয়ের সমীকরণের মধ্য দিয়ে একটি বৃহত্তর সমগ্রতার, একটি সংশ্লেষণের।

আশুবাবুর যৌবনকালটা কেটেছে ইউরোপে, শিক্ষাদীক্ষাটাও

তাঁর ওখানেই শেষ হয়েছে। আশুবাবু বড়লোক, তাঁর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণ সকলকে মুগ্ধ করেছে। এ আচরণ ভদ্রতা নয়, এ তাঁর সহজ আচরণ, এ তাঁর প্রাণের প্রকাশের দিক। সকলের সঙ্গে তিনি এমন সহজে মিশলেন যে "এঁরা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক একথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহখানেকের বেশি সময় লাগে নাই।"

কমলের সঙ্গে আশুবাবুর মত-পার্থক্যটি প্রেমের একনিষ্ঠতা নিয়ে শুরু হয়েছিল সেই তাজমহলের নীচে। আশুবাবু অন্যত্র বলছেন, "লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কতবড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি কোরে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষও দিই নে, ছোটও মনে করি নে। শুধু ভাবি, আমি পারি নে। শুধু জানি, মণির মায়ের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব।" অথচ কমল একে শক্তি বলে না, বলে চিত্তের অক্ষমতা। তার কথা, "নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করি নে, আদর্শ বলেও মানিনে।...একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই।...ভালোবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে ভালোবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে

অহরহ লালন করে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকেই ধ্রুবজ্ঞানে জীবন যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি তো ভেবে পাই নে।” আশুবাবুর কথা হচ্ছে “পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্য নয়, স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু পারে না,—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনাও করতে পারি নে।”

এই অক্ষমতাকেই কমল বলছে “বুড়ো মনের” ফল। কেবল বয়সে বুড়ো হলেই যে বুড়ো মন হয়, তা নয়, কেউ কেউ বুড়ো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অতীতটাকেই যারা জীবনে একান্ত ও একমাত্র করে তোলে, কমল তাদের মনকেই বলেছে বুড়ো মন। বুড়ো মনের সে সংজ্ঞা দিচ্ছে, “যে মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবি নেই, বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব, তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙিয়ে খেয়ে জীবনের বাকি কটা দিন টিকে থাকতে চায়।” এই বুড়ো মনের “হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই—এই তো শান্তি, এই তো মানুষের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের ভালো ভালো বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ করে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য

নয়, আনন্দলোকের বিসর্জনের বাজনা, একথা সে জানতেও পারে না।”

ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে সভ্যতাকে আশ্রয় করে টিকে ছিল, বিগতপ্রায় সেই সভ্যতা এই বুড়ো মনের জনক। এ সামনের দিকের বাস্তবতা স্বীকার করে না। প্রকৃতি সেই কবে সৃষ্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু অনন্তকাল পর্যন্ত সেই অনাদি প্রকৃতির লীলারসাস্বাদন চলতে থাকবে, এ তারা স্বীকার করে না। তাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যার শুধু অতীতই আছে, ভবিষ্যৎ নেই, সে-ই তো বুড়ো। অপরিহার্য অতীতকে রাখতে গিয়ে তারা অপরিহার্য ভবিষ্যৎকে রাখতে পারে নি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—একটা অতীতের সূত্র বেয়ে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই দিক থেকে এই অতীতের দান অনেকখানি। পক্ষান্তরে অতীতকে বেমালুম অস্বীকার করে যে ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র দাঁড়াতে চায়, সে ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র অর্থহীন, ভাববিলাসী। এই বুড়ো মন মানুষকে যা দেয়, মানুষের তা-ও পরম সঞ্চয়।

একদিকে প্রজ্ঞাবান আশুবাবুর অতীতকে শক্ত খুঁটি করে রাখার স্থিতি, আর একদিকে উৎফুল্লপ্রাণ কমলের চিরযৌবনের জয়গান। মানুষ কোন্‌টিকে গ্রহণ করবে? দুটো খোঁচাই যে একই মানুষের সহজাত। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ আপন সত্তার এই পারস্পরিক বিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন হল মানুষ আলো-

অন্ধকারের পরস্পরবিরুদ্ধধর্মময় এই পৃথিবীর বুকে সভ্যতার সৃষ্টি করে আসছে। এই ভারতবর্ষের বুকে কত দীর্ঘকালের মানুষের পদসঞ্চরণের অস্পষ্ট ছাপ রয়েছে, কত বা পুরাণের মধ্যে, দর্শন সাহিত্য শিল্পের মধ্যে ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের এই সমস্ত ইতিকথাকে অনুসরণ করে দেখলে দেখা যাবে, মানুষের সমগ্র সত্তাটি কালে কালে কত বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, কি সর্পিল তার গতি! তার সভ্যতার প্রথম দিনগুলিতে মানুষ কোন একটিমাত্র বাধা পথে একে চালনা করবার প্রয়াস পায় নি। এই জগৎ ও জীবনের দিকে তাকিয়ে সে দেখেছে, আর বলেছে আশ্চর্য! নানা জনে একে নানাভাবেই দেখেছেন, কিন্তু অসত্য কেউই দেখেন নি। এক এক জায়গায় দাঁড়ালে, এক একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করলে জগৎ ও জীবন এমনই রকমফের হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ক্রমে ভারতবর্ষ একান্তভাবে 'বুদ্ধিমান' হয়ে দাঁড়াল। মনুষ্যসত্তার পরস্পরবিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে সুরু করলে, এ নয়, এ নয়; এর কোন একটা তার পথ, কোন একটাকে নিতে হবে। কোন্‌টা সে নেবে? দ্বন্দ্বমোহমূঢ় মানুষ তখন ঠিক করলে, এমন একটা কাঠামো তৈরী করা যাক্, যা মানুষকে একটা নিশ্চিত পথচলার ঝঞ্ঝাটহীন নিশানা দেবে, যাতে করে পরস্পরবিরুদ্ধতার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে গোলকধাঁধায় হয়রাণি হতে হবে

না। বললে, সদাচঞ্চল প্রাণের উদ্বেল তরঙ্গকে বাদ দিয়ে জীবনকে সরল হতে সরলতর করে আনবার উজানপথে চলো, দেখবে সহজ, সরল হয়ে আসবে জীবনযাত্রা। তাই বহু-ধর্মী কর্মময় প্রাণকে বাদ দিয়ে একমাত্র একেরই ধ্যানে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলে। যে বহুধর্মী প্রাণকে সে বাদ দিলে, পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা তাই দিয়েই গড়ে তুলল তার সভ্যতার ইমারত—তাই বহুর প্রকাশক্ষেত্র এই জগৎটাকেই সে একান্ত সত্য বলে জেনেছে।

কিন্তু প্রাণকে তার বহুত্বের সচলতা বজায় রাখতে গেলেই একক, সনাতনকে, অতীতকে স্বীকার করতে হবে, প্রজ্ঞার স্থিরতার সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। অতীতের, একত্বের পরম সঞ্চয়কে বুকে নিয়েই অজানা ভবিষ্যতের পথে তাকে রওনা দিতে হবে। নয়তো সে যাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, অনাচারী হয়ে ; কিছু দূর গিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়বে। কেননা জীবনের পিছটানও তার সত্যতা বজায় রাখবে যে। স্থিতিহীন গতি উচ্ছৃঙ্খলতা, গতিহীন স্থিতি ক্লৈব্য। তবে অতীত ততখানিই বর্তমানের পক্ষে সত্য, যতখানি সে বর্তমানের সঙ্গে সাধারণ (common)। যে অতীত বর্তমানকে আবার ভবিষ্যতে গড়ে ওঠবার পথ বন্ধ করে দেয়, ভবিষ্যতের নূতন অজানার মুখ একেবারে খতম করে রাখে, সে অতীত পরিত্যাজ্য বটেই। আশুবাবু যখন মৃতপত্নীর স্মৃতিতে আটকে পড়ে গেলেন, জীবনের কোন অবস্থাতেই আর কোন সত্যের উপলব্ধির দুয়ার যখন তাঁর বন্ধ

হয়ে গেল, তখন সে অবস্থা আনন্দলোকের বিসর্জনের বাজনাই বাজায় বটে। একান্ত ভাবে অতীতের স্মৃতিকেই সম্বল করে, তাকেই মনের মধ্যে লালন পালন করে আশুবাবু বেঁচে আছেন, তাইতো সেই যৌবনকালেও নিজেকে বিস্তৃত করবার কথা, অন্য কাউকে অন্তরে স্থান দেবার কথা তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়েছে।

স্মৃতি স্মৃতিই, তার বেশি নয়; ওর মূল্য যতখানিই, ততখানিই সে পেতে পারে, তার বেশিও না, কমও নয়। পত্নীপ্রেমের স্মৃতিকে স্মৃতিহিসেবে সদা জাগরূক রেখেও, তার পাওনা মূল্য দিয়েও আশুবাবু যদি জীবনের তাৎকালিক আবেষ্টনানুযায়ী ভবিষ্যৎকে নিৰ্দ্বন্দ্ব আস্বাদন করতে সক্ষম হতেন, তবেই তিনি সহজ জীবনধর্মী হতে পারতেন। আমরা বলে এসেছি যে বুদ্ধি বা হৃদয়, অতীত বা বর্তমান, সাতত্য বা ক্ষণ—এদের কোনটাতেই আটকে যাওয়া (fixation) সহজ জীবনপ্রবাহ স্বীকার করে না। যৌবনকালে লোকান্তরিতা পত্নীর স্মৃতি রক্ষা করতে গিয়ে সম্মুখের জীবনপ্রবাহ যদি স্তব্ধ হয়, তবে তাকে স্বীকার করা চলে না। তাই আশুবাবুর অতীতের স্মৃতির স্থিতিতে আটকে না যাওয়া এবং কমলের প্রাণের গতিমুখেও আটকে পড়ে ভেসে না যাওয়া—এ দুটো মেলে কোথায়, কি করে? দুটোকেই স্বীকার না করে উপায় নেই, দুটোরই বাস্তব সত্যতা রয়েছে কোনমতেই যাদের অস্বীকার করে উড়িয়ে দেওয়া

যাবে না। তাই আজকের প্রশ্ন—এ দুটো মিলবে কি করে, কোথায় ?

একজনের স্মৃতির একেতে আটকে পড়া আর একজনের স্মৃতিহীনতার দুরন্ত জোয়ারে আটকে পড়ে বহু মানুষকে অবলম্বন করা—দেশকালপাত্রের ক্ষেত্রে এই দুই আটকে-পড়াকেই ঠেকানো যায় কি করে, পরিশেষে আমরা তার আলোচনা করব।

কাহিনীর মধ্যের বহু ঘটনা এবং চিন্তার প্রকাশে আশুবাবুর জীবন চিরস্থায়িত্বের জয়নাদ ঘোষণা করেছে, একেত্বের স্নিগ্ধ শান্তিবারি ছিটিয়েছে। অথচ তিনিই আবার স্ত্রীপুরুষের সমান দায়িত্ব ও সমান অধিকারতত্ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তিনি বলছেন, "আমাদের হিন্দুসমাজের একটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই, কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারি নি।" অন্যত্র কমলকে বলছেন, "চরিত্রদোষে যে স্বামী অপরাধী, তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে, এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মানতে পারি নে।" কিন্তু কেন যে এদেশে অপরাধ করেও পুরুষ তিন পা হাঁটলেই শুদ্ধ হয়ে যায়, আর একবার অপরাধ করলে নারী সারা জীবনেও আর শুদ্ধ হতে পারে না—অতীত ভারতের শাস্ত্র-সমাজকে বিমুগ্ধ মনে স্বীকার করে ফেলে

ওর ভেতরকার এ গরমিলের কারণটা আশুবাবু ধরতে পারেন নি। এ কথাটা তিনি মেলাতে পারেন নি যে, আমাদের সমাজ-শাস্ত্র যাঁরা গড়েছিলেন তাঁরা স্ত্রীপুরুষের সমান দায়িত্ব ও সমান অধিকারতত্ত্বে মোটেই আস্থাবান ছিলেন না এবং ভারতের ঐ চিন্তাধারার মূলেই ও কথা স্বীকৃত হয় নি। সেইজন্যই শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় থাকে না, কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার সহস্র পথ খোলা।

দীর্ঘদিনের সভ্যতার স্থল এই ভারতবর্ষে নানা চিন্তাধারার স্রোত বয়েছিল। কিন্তু যে ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের রক্তের মধ্য দিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত বয়ে এসেছে, ধর্মের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"বাদের প্রজ্ঞা-প্রধান চিন্তাধারা; আর সমাজের ক্ষেত্রে সেইটেই হচ্ছে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"র পুরুষকেন্দ্র সমাজবাদ। জগৎকে পারমার্থিক-ভাবে স্বীকার করলেই বহুকে স্বীকার করতে হয়, বাস্তবের চঞ্চলতাকে স্বীকার করতে হয়, ভবিষ্যৎকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতিকে একদিন শেষ করে ফেলতে পারা যায়, যা পরিবর্তনশীল অতএব অনিত্য, তার কোন পারমার্থিক, কোন তত্ত্বতঃ সত্যতা নেই,কেবল যা নিত্য চিরস্থায়ী তা-ই সত্য—এই উজান সাধনার কথাই আমরা জেনে এসেছি। অতএব ভারতের বিভিন্ন চিন্তাধারাকে একত্র করে ফেলে জট না পাকিয়ে আজ পর্যন্ত যেটা টিকে ছিল আমাদের ধর্মসমাজ ব্যবস্থার মধ্যে—যার সামনে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আর কেউ আসন পায় নি,

যার চিরস্থায়িত্ব বৌদ্ধপ্লাবন থেকে সুরু করে মুসলিমসংস্কৃতির ধাক্কাকে পর্যন্ত ঠেকিয়ে আসছিল—সেইটের কথাই বিচার করে দেখতে হবে।

ভারতবর্ষের সমাজ বলতে আমরা যে কয়জন দু'চার কলম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ও তথা সাতমিশানো মশলায় রচিত একটা জগাখিচুড়ীর চিন্তাধারায় বর্ধিত হয়ে পরে ওগুলোর অবাস্তবতা সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করেছি, তাদেরকেই যে বোঝায় না, ভারতবর্ষের সমস্যা চিন্তা করবার সময় এ কথাটা যে আমরা অনেকেই ভুলে যাই, লজ্জার সঙ্গে হলেও সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সমগ্র ভারতের বক্ষের উপর কান রেখে এর সমাজ-চেতনার স্পন্দনকে শুনতে চেষ্টা করলে যে জিনিষটা ধরা পড়বে, সেটার সঙ্গে মূলবিচ্যুত আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতদের চিন্তাধারার যে অনেক তফাৎ, সে কথাটা মনে রাখা কর্তব্য। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার আকুতি কি, সভ্যতার কোন্ স্তরে গিয়ে সে দাঁড়াতে চাইছে, একথা আমরা ধরতেই পারব না, যদি আমরা এতদিনকার প্রচলিত ধর্মসমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোটা ও সেই সঙ্গে তার যা হারিয়ে গেছে তাকেও চিনে নিতে না পারি।

বিস্তৃতভাবে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, আমরা সংক্ষেপে দু'চার কথা বলব। শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই, আর তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার সহস্র পথ খোলা। কেন এমন হল? "পুরুষের রচিত আচার

ও নিয়মের শৃঙ্খলে নারীদিগকে দাবাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সব নিয়মগঠনে নারীদের কোনই হাত ছিল না।··· (পুরুষেরা) নিজদিগকে নারীদের প্রভু, কর্তা প্রভৃতি মনে করিয়াছে, বন্ধু ও সহকর্মী এই দৃষ্টিতে দেখে নাই।··· নারীদের অবস্থা সেকালের সেই ক্রীতদাসের মত, যাহারা একথা ভাবিতেও পারিত না যে, কোনদিন তাহারা স্বাধীন হইতে পারে। নারীদিগকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা পুরুষের দাসী।” (মহাত্মা গান্ধীজী রচিত “গঠনকর্মপদ্ধতি” নামক পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ হইতে।) কেন এমন হল? বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি বাহুল্য। জড় পদার্থ ‘কাঞ্চনের’ সঙ্গে নারীকে সমশ্রেণীভুক্ত করে দিয়ে ‘কামিনী’-বর্জনের সাধনা ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন করে এসেছে। ভারতেরই ব্রহ্মলাভ সাধনায় নারী নরকের দ্বার বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। তার সমস্ত পরিচ্ছিন্নতার অন্তরে এবং তার বাইরেও যে তার একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র মূল্য আছে, একথা ভারতীয় যে-চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসা সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে স্বীকৃত হয় নি।

আমরা অনেকেই মনে করি যে, আজকের হিন্দুধর্মে ও সমাজে যে অনাচার, অত্যাচার, অবিচার, অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য রয়েছে, সেটা আসলে শাস্ত্রকারদের রচিত নয়, পরবর্তীকালে ভাটার জলের আবর্জনার মত ওগুলো এসে জুটেছে। দীর্ঘকালের পথ বেয়ে এসে নানা কালের নানা আবেষ্টনের মধ্য

থেকে সে যে অনেক আবর্জনাই কুড়িয়ে এনেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করছি না, কিন্তু অনেক বৈষম্য বিভেদ ব্যর্থতাই যে সেখানে আকস্মিক নয়, ওদের মূল যে ধর্মসমাজদর্শনের ভিত্তির মধ্যে রয়েছে—সে সম্বন্ধে অবহিত হতে না পারলে আমরা আমাদের প্রকৃত সমস্যাটাই ধরতে পারব না।

হিন্দুর চিন্তাধারার বিরাট সম্পদ সত্ত্বেও আজকের দিন পর্যন্ত চলে আসা সমাজের ব্যবস্থা বা অপব্যবস্থার ফলে গান্ধীজীকে বলতে হয়েছে 'নারীদিগকে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা পুরুষের দাসী।' কেন? একি কেবল আকস্মিক? একি শুধু ভাটার জলের আবর্জনার অসঙ্গতি?—একেবারেই নয়। গোড়ায় নরনারীর সমকক্ষতা বা নারীরও একটি স্বাতন্ত্র্য স্বীকারের অভাবই এর কারণ। যেখানে উভয়েরই স্বয়ংমূল্যবান (autonomous) ও স্বয়ংপূর্ণ স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্বীকার করা হয় নি, সেখানে সমান দায়িত্ব ও সমান অধিকারের প্রশ্ন একেবারেই বাহুল্য। নরের যেমন একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, নারীরও তেমন একটি স্বাতন্ত্র্য গোড়াতেই স্বীকার করা হয় নি বলে নারী পুরুষের দাসীমাত্রে পর্যবসিত হতে পেরেছে। এ স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করার পেছনের যুক্তিটা আমরা আগেই বলে এসেছি। আমরা যে অজড় অমর চিন্ময় একত্বেরই শুধু উপাসক ছিলাম; বহুকে, জড়কে, মৃণ্ময়ের পারমার্থিক সত্তাকে আমরা কোনদিন তো খুঁজে দেখি নি। বহুকে তত্ত্বতঃ স্বীকার করতে পারি নি বলে অবিদ্যাসংজ্ঞ জটিলতাময় কর্মকে স্বীকার

করতে পারি নি, তাই তার গৌরবও দিতে শিখি নি। ঐককেন্দ্রিক অদ্বৈতবাদী আমাদের কাছে বহুধাবিভক্ত বিচ্ছিন্ন এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের বিশেষ সত্যটুকু ধরা পড়ে নি, সে জৈবিক ধারাকে একান্ত মিথ্যা বলেই আমরা জেনে রেখেছিলাম। সেই চিন্তাধারাকেই টেনে এনে আমাদের সমাজব্যবস্থায়ও আমরা নারীকে পুরুষের মধ্যে বিলুপ্ত করে দিয়ে অদ্বৈতবাদী সমাজ গড়ে তুলেছি। তাইতে নারীর সেখানে শুধু কর্তব্য ছিল, অধিকার ছিল না, তাইতে সে দাসীরূপে গণ্য হতে পেরেছে। তাইতে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কোনও প্রশ্নের মীমাংসায় তাদের সহযোগিতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। নারীও পরবশতার আরামে দিন কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে। পুরুষ শুধু পুরুষ—এইটেই তার সর্বপ্রধান ও একমাত্র যোগ্যতা ছিল। 'মনুষ্যত্বে'র কথা তাই পিছনে সরে গিয়ে নারীর সত্তাকে সে শুধু লজ্জিত ও ব্যর্থ করে এসেছে। এতে সে নিজেও যেমন বিকশিত হতে পায় নি, অপরার্ধকেও নীচে টেনে নামিয়েছে। নর ও নারী উভয়কে একই অখণ্ড সমগ্র সত্তার অপরিহার্য সত্য অর্ধেক বলে আমরা যে জানতে পারি নি—এই কথাটাই কমল বহুস্থানে বলতে চেয়েছে।

একের পূজারী আর প্রজ্ঞার উপাসক আশুবাবুও যখন স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার তত্ত্বে বিশ্বাসী হন এবং বলেন যে, দুশ্চরিত্রকে ত্যাগ করার অধিকার কেবল স্বামীর আছে স্ত্রীর নেই, এমন কথা তিনি মানতে

পারেন না, দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করায় তিনি অন্যায়ও দেখেন না, তখন বুঝি প্রাণের স্পর্শ তাঁর জীবনে প্রবেশ করেছে। আশুবাবুর মধ্যের এই যে গরমিলটা, সেটা প্রমাণ করছে যে, তথাকথিত একনিষ্ঠার উল্‌টো দিকের কথাগুলিও একরকম আশুবাবুর অজানিতেই তাঁরও মধ্যে এসে গেছে। এই এসে যাওয়াটাই এই পরস্পরবিরুদ্ধ দুটো সত্তার মধ্যে ভবিষ্যতের সামঞ্জস্যের পথ ইঙ্গিত করছে। আসল কথাটি এই যে, যারা একত্বের কথা বলে, তারাও অজ্ঞাতসারে বহুত্বকে মানে, যারা বহুত্বের কথা বলে, তারাও তাদের অজ্ঞাতসারে একত্বকে মানে। এ ছাড়া জগতের মধ্যে, এই বাস্তবের রাজ্যে যে চলাই সম্ভব নয়। প্রয়োজন তাই প্রত্যেক মানুষকেই এই দুটো অবস্থাকে সচেতন ভাবে মানা, স্বীকার করা।

যাই হোক, আশুবাবুর মধ্যে চোরাবালি ছিল না, ভাবের ঘরে তাঁর চুরিও ছিল না। তাই প্রজ্ঞার একত্ববাদের উপাসক হয়েও কমলকে একদিন দেখে, একদিন তার আলোচনা শুনেই অপর দিকের সত্যটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন, শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি মানতে না পেরে থাকুন। এই প্রজ্ঞার একত্ব, রক্তের মধ্য দিয়ে যা আমরা পেয়েছি, তা যে জীবন-ধর্মের প্রশ্নের একদিক মাত্র, তা তিনি বলতেও পেরে-ছিলেন। ক্রুদ্ধ মনোরমা তাঁর সে কথা শুনে বলেছিল, "ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটি দেখাবার লোক ছিল না?" এর উত্তরে আশুবাবু বলতে পেরেছিলেন, "এ

অত্যন্ত রাগের কথা হল।···শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন, এমন হতেই পারে না। তা'হলে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।"

প্রাণেরই ক্ষীণ রেখা তাঁর জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলেই তাঁর মধ্যে এমন একটি রসোজ্জ্বল স্নিগ্ধ অবকাশ থাকতে পেরেছে যা তাঁকে বিরুদ্ধমতাবলম্বী কমলের থেকে আরম্ভ করে সকলেরই প্রিয় করেছে। প্রাণের ঐ অবকাশের আকাশটুকুর জন্যই তো কমলই তাঁকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করলেও কমলকেই তিনি সবচেয়ে ভালবাসতে পেরেছেন, তাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাইতে যদিও জানেন কমলের সঙ্গে তাঁর মতে মেলে না, তবু নিজে যখন আর সামনের দিকে পথ দেখতে পান না, তখন কমলের জন্যই ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করেন। অথচ তার মত মেনে নিতেও কষ্ট হয়।

শিবনাথ-মনোরমা বিয়ে ঠিক করেছে, তারা আশুবাবুর আশীর্বাদ চেয়ে পত্র দিয়েছে। আশুবাবুর চোখে ঘুম নেই; আজ কমলকেই তাঁর সব চেয়ে প্রয়োজন—যদি কমল কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারে, যদি তার মতামত বা আশ্বাসে কোন পথ দেখা যায়। কিন্তু কমলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পর একদিন এল কমল। আশুবাবু জানালেন হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেলেও পিতার কর্তব্য থেকে তিনি চ্যুত হবেন না।

কমলকে বলছেন, "আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও পিতার কর্তব্যে অপরাধ না করি।" কাল তাদের তিনি লিখে জানাবেন, এর পরে মণি যেন না তাঁর কাছে এক কপর্দকও আশা করে। কমল এর কোন জবাব দিলে না বলে আশুবাবু ব্যাকুল হয়ে বললেন, "চুপ করে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না?" কমল বলছে, "কই, প্রশ্ন তো কিছুই করেন নি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে যে শক্তিমান, দুর্বলকে সে দণ্ড দেয়, এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসচে। এতে বলবার কি আছে?" আশুবাবু আহত হলেন। মনোরমাকে ভুল থেকে বাঁচাবার জন্যেই তিনি এত কঠিন হতে চেষ্টা করছেন—সন্তানের সঙ্গে তো শক্তি পরীক্ষার সম্বন্ধ নয়। উত্তরে কমল বলছে যে, এ পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করে তার দুঃখ ঠেকান গেল না বলে "যে লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেছেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় কোরে বিসর্জন দেবেন, ফেরবার পথ তার কোন দিন কোন দিক দিয়েই খোলা রাখবেন না?"

আশুবাবু মনে করছেন, মনোরমা এই যে ভুল করল, এতে তার একেবারে চরম পতন হয়ে গেল—তার সামনের দিকে এখন শুধু অন্ধকার, কোন পথই আর সেখানে নেই। সেইজন্যই তাঁর এত উদ্বেগ, এত আশংকা। একত্বের সেবক আশুবাবু স্বামী ত্যাগ করে ফেরবার কথা ভাবতেই

পারেন না। কিন্তু কমলের কথা হচ্ছে, "মণি যেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সে দিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে পারে।" কমলের মতে "সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহও একটা ঘটনা, তার বেশি নয়; ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যে দিন মেনে নিয়েছেন, সেই দিনই সুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি।" কিন্তু পুরুষকেন্দ্র অদ্বৈতবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এ কথা একেবারেই সত্য নয়। সেখানে বিবাহ নারীজীবনের একমাত্র ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না, আগে পরে তাকেই কেন্দ্র করে নারীর সকল রচনা চলতে থাকে। জীবনের সেই একবারের একটিমাত্র ঘটনায় বিধাতা সুখ দেন ভাল, নয়তো পূর্বজন্মের কর্মফলস্বরূপ সেই দুঃখের বোঝাকেই আমরণ বয়ে চলতে হবে, তার থেকে মুক্তির কোনও পথ নেই।

একটিমাত্র ঘটনা দিয়ে সমস্ত জীবনকে বেঁধে ফেলবার এই যে প্রচেষ্টা, এও মানুষের জীবনের একটি সত্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা তখনই সার্থক, যখন সেই একটি ঘটনাই বহুধর্মী হয়। একান্ত এক যে একটি ঘটনা, তাকে দিয়ে সমস্ত জীবনকে বেঁধে ফেলা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। শিবনাথকে ভালবাসা মনোরমার পক্ষে ভুলই যদি হয়, তবে ফেরবার পথ বন্ধ করে দেওয়াই কি তার কল্যাণের পথ? ভুল মানুষে করে কিংবা হয়, কিন্তু সংশোধনের পথ যদি সম্মুখে খোলা না থাকে, তবে সে কেমন মানুষের

সভ্যতা ? মানুষ তো যন্ত্র নয়। যুগে যুগে ভুল করতে করতেই সে সামনের দিকে এগোতে পেরেছে। ভুলকে তো ভয় নেই, যদি সামনের দিকে পথ খোলা থাকে, যদি সে ভুলকে হজম করা যায়, যদি বোঝা যায় সম্মুখের ভবিষ্যতে সে কি ইঙ্গিত যোজনা করছে, কোন্ নূতন আলোর খবর নিয়ে আসছে।

আর সমস্ত ভুল ত্রুটিরই সংশোধনের পথ থাকে, তাকে মানুষ খারাপও বলে না। কিন্তু জীবনের এই একটি মস্তবড় দিকটিতে ভুল যদি সে করে, তবে তার সম্মুখের পথ চিরদিনের মত অবরুদ্ধ হয়ে যাবে—এ কেমনতর সভ্যতা ? অনাদি অনন্ত প্রকৃতির লীলাময় এ সংসারের সামনের দিকটি তো বদ্ধমুখ নয়। জীবনের চলার পথের এত বড় একটি ঘটনা—তা সে নিজেই করুক কিংবা অপরেই করে দিক্—একবারেই পরিপূর্ণ শুদ্ধ করে করা যাবে, এ না-ও হতে পারে। তাই বলে সেখানেই সব শেষ হয়ে যাবে ? দেশ-কাল-পাত্রের আবেষ্টনের কোন বিচারই আর হবে না ? তা নয়—মানুষকে চলার পথের নূতন নূতন ক্ষেত্রে নূতন নূতন প্রকাশের, প্রয়োজনের আহ্বানে অকুণ্ঠ সাড়া দিতেই হবে। কোন একদিনকার যেমন বাইরের ঘটনায়, তেমনি মানসিক অবস্থায় আটকে পড়া চলবে না। কিন্তু আশুবাবু এ কথাটা বুঝে উঠতে পারেন না।

চলে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে, মনোরমার আঘাত

অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন, আবার আঘাত এল নীলিমার তরফ থেকে। এ ক্ষেত্রেও কমলের সঙ্গে তাঁর মতে মেলে নি। তফাৎ যেন আকাশপাতালের। আশুবাবু পরলোক মানেন, জন্মান্তর কালের জন্য অপেক্ষা করাও তাঁর পক্ষে অসুবিধেজনক নয়। "এই জীবনটাকেই যারা মানবাত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেছে তাদের অপেক্ষা করা চলে না, তৃষ্ণার শেষ বিন্দু জল এ জীবনেই নিঃশেষে পান কোরে না নিলেই নয়; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত, উপুড় হয়ে শুয়ে খাবার প্রয়োজন হয় না।" এর সম্পূর্ণ বিপরীত উত্তর দিচ্ছে কমল। সে বলছে, আকাশকুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তর কাল প্রতীক্ষা করবার আমার ধৈর্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজবুদ্ধিতে পাই এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে এই জীবনটাই আমার যেন ভরে ওঠে; পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। এমনি কোরেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে তুচ্ছ করে দিয়েছে।"

দুইজনের মতের প্রভেদ লক্ষনীয়। ভারতবর্ষ তার যে দর্শনের এক খোঁচায় ইহকালকে সান্ত প্রমাণ করে, একে মায়া মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলে, সে-দর্শন যে তাকে সমগ্র জগতের

কাছে শেষরক্ষা করবার শক্তি দেয় নি, সেই স্পষ্ট সত্য কথাটা কমল ব্যক্ত করলে। স্থূল অন্নবস্ত্র বলে যাকে সম্মান দেওয়া হয়নি, সেই স্থূলের ক্ষেত্রের লাঞ্ছনা ভারতবর্ষের আন্তর সাধনাকে আজ ব্যঙ্গ করে ফিরছে। জড় এই মাটির জগৎকে ভারতের প্রচলিত শাস্ত্র ও সমাজব্যবস্থা নিতান্ত জড়ই মনে করেছিল। তাই তার প্রাপ্য সম্মানটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত করে এসেছিল। আজ সেই মৃত জড় তার অক্টোপাসের শত বাহু বিস্তার করে চেতন-ভারতকে পিষে ফেলতে চাইছে। তারা ছিল আত্মার ধ্যানে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায়; ইহকাল ছিল নেহাৎ নোংড়া। "তাঁরা এ জগতের সব কিছু পদার্থকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতঃই এমন কিছু দেখতে চান যা অপরিণামী, অবিনাশী এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য আনন্দময় ও অমর। তাঁদের কাছে এ জীবন কিছুই নয়, এর চেয়েও উচ্চতর আরও কিছু পাওয়ার লোভে তাঁরা একে ঘৃণাই করে এসেছেন।"—বিবেকানন্দ

কিন্তু বিজ্ঞানও যেমন আজ জড়-চেতনের শক্ত ভেদ আর স্বীকার করতে পারে না, তেমনি আধুনিকতম দর্শনশাস্ত্রও জড়-চেতনের পারস্পরিক বিদ্বেষ-ঘৃণা ও অবিশ্বাসের একান্ত বিরুদ্ধধর্মিত্ব আর স্বীকার করতে পারে না। জড়বাদকে এতদিন ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখেছে বলেই অজড়বাদী ভারতবর্ষকে আজ জড়বাদের কাছে এমন পরাজয়ের গ্লানির তিলক গ্রহণ করতে হল। ইহলোককে তুচ্ছ করেই

তো আজ আমাদের পেটে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, প্রাণে আনন্দ নেই ; তাই অমিত লোভ, ভার-সাম্যহীন মানসিক ছন্দপতন। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙ্গা কুটীরের মধ্যে দুঃসহ দুর্দিনের দীর্ঘনিঃশ্বাসের প্রস্বনন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে সমগ্র মানবতাকে বিদ্রূপ করছে। যে কোন একের একান্ত (absolute) হয়ে ওঠা যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ায় অপরের প্রতিযোগিতাময় কুশ্রী প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের এতদিনকার জড়বিদ্বেষী জড়অবিশ্বাসী একান্ত অজড়বাদের সভ্যতা তাই আজ প্রমাণ করে দিলে। কমল বলেছিল, "যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মচিন্তাই হয়, তো এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।" বিশ্বের মধ্যে বাস করে যারা একে হজম না করে একে বাদ দিয়ে শুধু বিশ্বাতীত সত্তার ধ্যানে রইল, তারা যে সেই ধ্যানের মধ্য দিয়ে মোহকে, ভ্রমকেই শুধু প্রশ্রয় দিলে, এ কথার বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

জড়সভ্যতাহীন একান্ত অজড়সভ্যতা, অনাত্মাবিদ্বেষী একান্ত আত্মদর্শন, প্রাণহীন একান্ত প্রজ্ঞা এই পরস্পরবিরুদ্ধ ও পরস্পরপরিপূরক আলো-অন্ধকারের জগতে যেমন টেকেনি, দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসরের হলেও না, তেমনি অজড়-

জ্ঞানবিহীন, আত্মদর্শনহীন পাশ্চাত্যের একান্ত জড়সভ্যতাও তার সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়েও টিকতে পারছে না, ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে সে শুধু হাহাকার করে মরছে। জড়বাদ তার শেষ সিদ্ধান্ত সাম্যবাদে এসেও প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না, ঘনান্ধকারের মধ্যে সে আজ পথ হাতড়ে ফিরছে। তাইতো আমরা কাহিনীর মধ্যের আশুবাবুকেও যেমন স্বীকার করতে পারছি না পুরোপুরি, তেমনি পারছি না কমলকেও করতে। আশুবাবুর অজড়বাদ, আশুবাবুর প্রজ্ঞার একত্ব ও নিশ্চলতার স্থিতি আর কমলের জড়বাদ, কমলের প্রাণের বহুত্বের সচলতার গতি, মানুষের যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি তার সমষ্টিজীবনে, আজ মিলতে চাইছে। এ দু'য়ের মিলনের মহাতীর্থে গড়ে উঠবে নূতন যুগের নূতন দেশের সভ্যতা, যার নাম সহজ জীবনের সভ্যতা, যার মধ্যে প্রজ্ঞা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণ স্বতঃস্ফূর্ত, কারো চাপাচাপিতেই কারো নিঃশ্বাস-বন্ধ হয়ে আসবার অবস্থা যেখানে ঘটবে না।

আশুবাবু ভাল করেই জানেন যে সত্যের মূলগত সংস্কার তাঁদের দুজনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন; তবু সেদিন ইহ-পরকাল নিয়ে এতবড় বৈষম্যও যখন স্পষ্ট করেই ব্যক্ত হল, তার পরেই প্রস্থানোদ্যত কমলের হাতটা আশুবাবু সহসা জোর করে ধরে ফেলে বললেন, "যাচ্ছো মা? তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠে।" ঐকদেশিক এক সভ্যতা পূর্ণতর হয়ে উঠবার প্রেরণায় এমন

ব্যাকুলতা নিয়েই তার অপর দিককে আকাঙ্ক্ষা করে!
"কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে তো আমি কোন দিক দিয়েই ভরসা দিতে পারি নে। দেহে মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারো চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসিনে কাকাবাবু।" আমরা এতকাল বুদ্ধির বিচারের সঙ্গে হৃদয়াস্বাদনের বিরোধটাই কেবল লক্ষ্য করে এসেছি। কিন্তু আজ বাইরের জগতের নানা ঘটনার মত আমাদের কাহিনীর মধ্যেরও আশুবাবু ও কমলের পারস্পরিক অপেক্ষমানতা এই কথাই বলতে চাইছে যে, এই বুদ্ধি ও হৃদয়ের মিলন ভূমিতে দাঁড়াতে পারলেই সকল শেষপ্রশ্নের শেষ সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এঁরা যে পরস্পরকে অপেক্ষা করছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে এইজন্যেই যে, প্রত্যেকের মধ্যেই যা তিনি প্রধানভাবে নন, তা-ও তাঁর অন্তরের পটভূমিকায় রয়ে গেছে।

মনোরমার ব্যাপারটিকে আশুবাবু কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। তিনি বলছেন, মনোরমার পক্ষে "এ মোহ, এ ভালবাসা নয়—এ ভুল তার ভাঙবেই।" কমল বলে, "শুধু ভুলই যে ভাঙে তা নয়, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙ্গে পড়ে।" নীলিমা জিজ্ঞেস করলে, "সত্যিকার ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙ্গে পড়ে, মানুষ তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকি থাকবে কি?" কমল উত্তর দিল, "যে স্বর্গবাসের মেয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর

তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র।" সত্যিকার ভালবাসাও ভেঙে পড়ে বটে এবং ভেঙ্গে পড়লে কমল যে ব্যবস্থা দিয়েছে, তা ছাড়া মানুষের পক্ষে করারই বা কী আর থাকে? "হৃদয়ের আদালতে এক তরফা বিচারই একমাত্র বিচার; তার তো আর আপীল কোর্ট মেলে না"—তাই ভেঙ্গে যদি পড়েই, মেনেই নিতে হয়। বিলাপের ধূঁয়ায়ও যেমন তাকে বিদ্রূপ করে লাভ নেই, তেমনি বিদ্বেষের কালো অভিযোগে তাকে কলঙ্কিত করেও লাভ নেই। সম্মুখের দিকে পথ খোলা রেখে তাকে শত দুঃখেও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে থাকে, তখন সত্যিকার ভালোবাসা প্রায়ই ভেঙ্গে পড়লে সে সমাজ টেকে কি করে?

মানুষ যখন শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসে, তখন ঐ ভালবাসারই জোরে তাকে সব দিক দিয়ে ঠেকা দেওয়া সম্ভব হয়েই ওঠে না, যদি সে ভালবাসা সমগ্র-চুম্বিত না হয়। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত, পরিবারগত সম্বন্ধসম্পর্কগুলি যখন মানুষের সমগ্রতার স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রকাশ লাভের সমন্বিত ছন্দে গাঁথা থাকে, তখন প্রতি মানুষকে বিশেষ করে কোন দিকটির জন্যই ভাবতে হয় না। কিন্তু সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা যখন বানচাল হয়ে গেছে, তখন প্রতি মানুষকেই সচেতন জীবন যাপন করতে হয়। কেননা তখন মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের, জ্ঞানপ্রেমের সঙ্গে কর্মের, জ্ঞানপ্রেমকর্মের সঙ্গে ভক্তির, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধির, সহজ জীবনধারায়

যেগুলি পরস্পরসম্পর্কিত অপরিহার্য অংশ, সেগুলির সকলের সহজ স্থান থাকে না। সমাজের সহজ সুস্থ অবস্থায় কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসার তবু বা অবকাশ থাকে, কেননা তখন ভালবাসার দ্বারা জীবনের অপর স্বাভাবিক দিকগুলির আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। নরনারীর মিলনের মহাতীর্থের বারিসিঞ্চনে সেগুলি বেড়ে ওঠবার পথে এগিয়ে চলতে পারে। কিন্তু দেউলিয়া ঐকদেশিক সমাজের বিপর্যস্ত অবস্থায় মানুষ যদি জীবনের সমগ্রতা ভুলে গিয়ে কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসতে চায়, তবে সে ভালবাসা জীবনের সমগ্রতার সুরের খোঁজ দিতে পারে না। তখনই সত্যিকার ভালবাসারও সংসারে ভেঙে পড়বার পালা ঘটে। কেননা মানুষের সমগ্র সত্তা তো বসে থাকতে পারে না, আবেষ্টনকে নিয়ে যে সে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভক্তিতে বুদ্ধিতে হৃদয়েতে কেবল বেড়েই চলবে। তখন ভালবাসাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলতে না পারলে, সে পিছনে পড়ে থাকলে, মানুষের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে তার বিরোধের অন্ত থাকে না। অর্থাৎ ভালবাসাকে সমস্ত-কিছু-নিরপেক্ষ একটি একান্ত বিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তির ভাববিলাস করে তুললে সে হয়ে যায় মিথ্যা ; তখনই সে ভোগ হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তা অকল্যাণের রূপ ধরে, তখনই তাকে পরিত্যাগ না করে আর পথ পাওয়া যায় না।

মনোরমার ভালবাসা সম্বন্ধে আশুবাবু বলছেন—এ মোহ, এ মিথ্যা, এ ভালবাসা নয়। যা মিথ্যা, তা মিথ্যা, যা

ভালবাসা নয়, তা ভালবাসা নয়ই। কিন্তু মোহমাত্রই মিথ্যা নয়। মিথ্যা ও মোহ একার্থবাচক শব্দ নয়। ও দুটো এক বস্তুও নয়। মোহও একটা বস্তু, বস্তু হিসেবে ওরও একটা সত্যতা আছে। মোহ মিথ্যাও হতে পারে, সত্যও হতে পারে। আমরা এতদিন জেনে এসেছি, যা চিরকাল থাকে তা-ই সত্য, যা চিরকাল থাকে না তা-ই মিথ্যা। নিত্যতাই সত্য, অনিত্যতাই মিথ্যা। সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক শুধু নিত্যধর্মেরই। যে আজ আছে কাল নেই, সে মিথ্যা নয়তো কি? কিন্তু আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক জীবন-দর্শন এ সত্য স্বীকার না করে পারে না যে, যা আজ আছে, কাল নেই তা পরিবর্তনশীল বটে, চঞ্চল বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়। সত্যের নিত্যতার একান্ত মানদণ্ডে সে এতদিন মিথ্যার অভিশাপ বহন করে এসেছে। কিন্তু রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দে ভরা সচল এই জীবনটা ও জগৎটার দিকে তাকিয়ে দেখি নিত্যতার মানদণ্ডে অপরাধী হয়েও তার প্রাণপ্রাচুর্যে সে অম্লান। মোহ অর্থ কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরা, যা ঐ অবস্থায় চিরকালীন হবে না। মোহ চিরকাল থাকে না, অতএব তা মিথ্যা—এ যুক্তি আর চলে না। সত্যতাকে চিরকালীনত্বের সঙ্গে অভেদ করে দেখেছে যে প্রজ্ঞাবাদ, এ যুক্তি তার। ক্ষণের বাইরে ক্ষণাতীত সত্য, কিন্তু সে-ই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য নয়। প্রতি ক্ষণগুলির মধ্যে একটি অখণ্ড ক্ষণাতীত সত্য রয়ে যায়। প্রতি ক্ষণ সত্য, ক্ষণাতীতও সত্য। ক্ষণিকের মোহ ক্ষণিকের বলেই মিথ্যা নয়।

সতীবিরহে শিবের উন্মাদ হওয়া মোহ, কিন্তু তা মিথ্যা নয়।

পরবর্তী ক্ষণে সেই উন্মাদ শিবই দেখি সমাধিস্থ—তখনই পূর্ব ক্ষণ পরিপূর্ণ সার্থক। আবার ঐ সমাধিস্থ ক্ষণও পরবর্তী ব্যুত্থানের মধ্যে সার্থক। যতক্ষণ শিব সতীবিরহে উন্মাদ, ততক্ষণ সে বিরহ-মুগ্ধতা মোহই তো বটে ; কোন কিছুকে কোন ক্ষণের জন্য আঁকড়ে থাকাই মুগ্ধতা, মোহ। কিন্তু সেটা তখনই পরিপূর্ণ মিথ্যা, যখন সে পরবর্তী ক্ষণে পরিণত হতে পারে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে গো, গোপ ও গোপীদের মধ্যে লীলারত, তখন তা একটা মোহ বটে, কিন্তু ঐ মোহই তো একমাত্র কথা নয়। তারপরে মথুরার ডাকে একদিন যখন তিনি সাড়া দিতে চলে গেলেন, তখন সে-ও আর একটি সার্থক ক্ষণ, এবং তাতেও মোহ বা মুগ্ধতা বা আঁকড়ে থাকা ছিল। কিন্তু ওদের প্রতিটিই সত্য বাস্তব ও সার্থক আস্বাদন। প্রতি ক্ষণ বা কর্মের প্রতি এ মোহ, এ মুগ্ধতা না থাকলে কর্ম সম্পাদন সম্ভবই নয়।

মোহ মিথ্যাও হতে পারে। কোন একটি ক্ষণে যে আস্বাদন চলতে থাকছে, তা আসলে সত্যভাবে আস্বাদিত হচ্ছে না, তার মধ্যে রয়ে যাচ্ছে ফাঁকি, তার মধ্যে রয়ে যাচ্ছে সততার অভাব। তখনই সেই বিশেষ ক্ষণে কৃত সেই মুগ্ধতা, সেই আস্বাদন, সেই মোহ, সেই কর্ম মিথ্যা। কিন্তু মোহমাত্রই মিথ্যা নয়। আবার যে আস্বাদন পরবর্তী ক্ষণান্তরে পরিণত হতে পারে না, সে আস্বাদন, সে মোহ সেই বিশেষ ক্ষণে সার্থক ও সত্য হয়েও সর্বের সঙ্গে, সমগ্রের সঙ্গে বিধৃত হতে না পেরে মিথ্যা বনে যায়। বস্তু, ঘটনা বা যা কিছু, সবকেই সত্য হতে হয় বিশেষের মধ্যে এবং নির্বিশেষ অর্থাৎ

সর্ব বিশেষের মধ্যে, সমগ্রের মধ্যে। তখনই সত্য পরিপূর্ণ সত্য।

অজিত যখন মোটরের মধ্যে কমলকে বলেছিল, "চল, আমরা চলে যাই"—তখন সে যে শুধু মিথ্যা দিয়েই কমলকে ভোলাতে চেয়েছিল তা নয়। একথা সে নিজেও বোঝে। কিন্তু রাতের যে মোহ দিনের আলোতে কেটে যায়, সে তো মিথ্যা, সে তো ক্ষণিকের মায়া—একথা না বলেও অজিতের বুদ্ধিমান মন পারে না। ক্ষণের মধ্যে যে সত্য আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা প্রাণের, তা হৃদয়ের। তার পরের মুহূর্তে মানুষ যে স্তরে গিয়ে দাঁড়ায়, তা বুদ্ধির। সেখানকার সত্যতা বিচারের বুদ্ধি দিয়ে পূর্বের হৃদয়াস্বাদনের ক্ষণিকের সত্যতাকে মেলাতে না পেরে মানুষ রায় দিয়ে দিলে ক্ষণিকের আস্বাদনই বেমালুম মিথ্যা। আসলে বস্তুর বস্তুত্ব দিয়ে সত্যতা যাচাই করলে ওটাকে মিথ্যা বলা যাবেই না।

বুদ্ধির যুক্তি বলছে, "কুহেলিকা যতবড় ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক, তবু সে-ই মিথ্যে, সূর্যই ধ্রুব।" ক্ষণিক আস্বাদনের সত্যতা বলছে, "কোন্ আদিমকালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি আছে। সূর্যকে সে বারবার আবৃত করেছে এবং বারবার করবে। সূর্য ধ্রুব কি না জানি নে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় নি। ও দু'টোই নশ্বর, হয়তো, ও দু'টোই নিত্যকালের।" কুহেলিকা বারবার এসেছে, বারবার চলে গেছে। তবু নেই নেই করেও তো তার বেমালুম অনস্তিত্ব আজও ঘটেনি! ঐ তার ধর্ম,

ঐ তার সত্য। কুহেলিকার ধর্ম, কুহেলিকার সত্য কুহেলিকারই, সূর্যের মত নয় বলেই তা মিথ্যা নয়। অনাদিকাল থেকে সূর্যও আছে, কুহেলিকাও আছে। অনন্ত ভবিষ্যতে তার সৃষ্ট হবার আবেষ্টন দেখা দিলেই সে সৃষ্ট হয়ে উঠবে। "মালতী ফুলের আয়ু সূর্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবে কে?" দীর্ঘস্থায়িত্বধর্মই আজ আর বস্তুর সত্যতার একমাত্র মানদণ্ড নয়। "সূর্যাস্তবেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বলবে কে?"

তবু "রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলে না, উপমা দিয়েও তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি!" সত্যই তো তার কি? সূর্যাস্তবেলাকার মেঘের রং একেবারেই অস্থায়ী, ঐ রং দিয়ে মানুষের ব্যথাও ঘোচে না; তবু তাকে মিথ্যা বলারও তো জো নেই। ক্ষণিকের মোহের আস্বাদনকে অস্বীকার করবার যেমন উপায় নেই—ওতে জীবনের বৈচিত্র্য নষ্ট হয়; তেমনি আবার রাতের মোহ দিনের আলোতে কেটে গেলেও চলে না—ওতে লাঞ্ছনার দায় এড়ান যায় না। ক্ষণের সঙ্গে চিরকালীনত্বের যোগসূত্রের ছন্দটি তাই বের করে নিতেই হবে। মানুষের জীবনের নানা বিভিন্ন গ্রন্থি (complex) গুলি যখন একে একে খসে পড়ে, তখন তার ক্ষণিক হৃদয়াস্বাদনের সঙ্গে বুদ্ধির চির-কালীন হিসেবের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাঁধে না। সমগ্রতার স্পর্শহীন বিপর্যস্ত সমাজের সকল ঐকদেশিক বেহিসেবের মধ্যে হৃদয়াস্বাদনের

সঙ্গে বুদ্ধির বিচারের দ্বন্দ্ব অহর্নিশ বেড়েই চলবে। তখন যে মানুষের চিন্তায়, ভাবনায়, কর্মের রসাস্বাদনে নানা গ্রন্থি পদে পদে।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে আশুবাবু ও কমল মনুষ্যসত্তার দুটো দিককে প্রকাশ করেন এবং তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের সূত্রে এ-ও প্রমাণ করা গেছে যে, ওঁদের বিরুদ্ধতার মধ্যে পরিপূরকতাও রয়েছে। তাঁরা দু'জনে দু'জনের চিন্তাধারার ফাঁককে কেমন সুন্দর করেই ভরে তুলবার প্রয়াস পাচ্ছেন! মনোরমার ব্যাপারে তার ভবিষ্যতের পথ খুলে রাখবার ব্যবস্থা দিয়ে কমল আশুবাবুর ফাঁক ভরছে, আবার অজিতের সঙ্গে কমলের বিয়ের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে আশুবাবু কমলের ত্রুটি ভরে তুলছেন। এমনি অনেক ঘটনায়।

লেখক বইটিতে আর একটি চরিত্রের অবতারণা করেছেন যার সঙ্গে আশুবাবুর যে মিল আছে তাও নয়, আবার কমলের তার সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্য তো নেই-ই, বরং বৈপরিত্য প্রচুর, অথচ উভয়েই তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। সে ব্যক্তি রাজেন। সমস্ত কাহিনীতে রাজেন খুব বেশী স্থান নেয় নি, অথচ সে একটি উজ্জ্বল চরিত্র; তার কথা আমাদের বিশেষ ভাবেই মনে পড়ে। প্রত্যেককেই দেবার মত সম্পদ তার ছিল। হরেন্দ্র সতীশ বিমুগ্ধ, আশুবাবু পুলকিত, কমল বিস্ময়াপন্ন। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আশুবাবুকে কমল ভালবেসেছিল, তিনি যে একটি বিস্ময়ের বস্তু সে কথা প্রথমে না হলেও পরে সে

অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পেরেছিল, কিন্তু রাজেনকে দেখা মাত্রই সে বিস্মিত হয়েছে।

রাজেনকে আমরা কতটুকু দেখেছি? কাশীতে আশ্রম স্থাপনা নিয়ে সে না-কি প্রাণপণ খেটেছে, অবশ্য যে কোন কাজ সে হাতে নেয়, তাতেই সে প্রাণপণ খাটে। সে ডাক্তারী পড়েছে, আরও এটা ওটা কি করেছে—কিন্তু কোনটারই শেষ দেখেনি। এদিকে দেখি আশুবাবুর বাড়ী থেকে পীড়িত শিবনাথকে তার বাড়ীতে সরিয়েছে রাজেন; প্রথমদিন শিবনাথের অসুস্থতার সংবাদটাও সে-ই দিয়েছিল কমলকে সেই অনেক রাত পর্যন্ত তার বাড়ীতে অপেক্ষা করে থেকে। আর একদিকে পীড়িত মুচিদের সেবা করবার বালাই তার। সেইখানে তার একটি বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে। সবশুদ্ধ রাজেন যাকে বলে বিপ্লবী-কর্মী। যন্ত্রচালিতবৎ সে কাজ করে। মুচীরা যখন একে একে যমের দুয়ারে যাত্রা করে, তখন সেই যাত্রাপথে মুচীদের সে যেমনভাবে রওনা করিয়ে দেবার কথা বিবৃত করে, তার মধ্যে তার অনুভূতি দরদ খুঁজে পাওয়া যায় না, কলের মানুষের মত সে নিয়মমাফিক কাজ সারে।

কিন্তু এই তার একমাত্র পরিচয় নয়। শিবনাথের ওখানে কমল আর রাজেন এসেছে। কিছুক্ষণ পরে রাজেন বললে তার ক্ষিদে পেয়েছে, সে খেতে যাচ্ছে। খেয়ে আসবার সময় সে কমলের জন্যেও কিছু খাবার কিনে নিয়ে এল। গত দুদিন যে কমলের খাওয়া হয় নি, এ খবরটি

সে কমলের বাড়ী থেকে আসবার সময়ই সংগ্রহ করে এসেছিল। সে বলেছে, "নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন মনে হল আপনারও ছদিন খাওয়া হয় নি, তাই আসবার সময় কিছু নিয়ে এলাম। "বললে, নিন্। হাত ধুয়ে নিন্, সাবধান হওয়া ভাল।" তার বলার নমুনা দেখে কমলের তার বাবার কথা মনে হল। বলবার ধরণে রসকস নেই, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা।

হরেন্দ্রসতীশকে রাজেন ভালবাসে, রাজেনের প্রতি হরেন্দ্র সতীশ চির অনুরক্ত। অবশ্য তাকে ভাল না বাসে এমন কেউ নেই। কিন্তু হরেন সতীশের সঙ্গে রাজেনের থাকা হলো না। সে বলছে, "তাদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে।" কমল উত্তর দিলে, "মন যেখানে মিলেছে, থাক্ না সেখানে মতের অমিল, হোক্ না কাজের ধারা বিভিন্ন, কি যায় আসে তাতে? ...মত ও কর্ম দুইই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালোবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে, তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।" রাজেন বলছে, "মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করি নে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হোয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য এবং মহত্ত্ব দুইই

প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি, এটা ভুল।" একটু পরে সে বলছে, "কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্মকে প্রতিহত করে?"

রাজেন কাজ বোঝে, কেবল মনের মিলে কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি করে, শুধু মনের মিলে কর্ম-জগৎ সচল হয় না। "আমরা চাই মতে ঐক্য, কাজের ঐক্য। ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই।...কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। এই আমাদের কষ্টিপাথর, ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুজনের মনের মিল দিয়ে তো সংগীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে-সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের শক্তিটাই রাজার শক্তি। হৃদয় নিয়ে তার গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম,—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।" কমলের কাছে এ সব নূতন কথা। এ তার বুঝবার কথা নয়। তার মতে মনের মিলন কেবল বড় কথাই নয়, একমাত্র কথা, মনে যদি মেলে তাহলেই সব হলো।

কিন্তু হায়রে, কমলের বিপ্লবধর্ম যে এখানে আর একবার হোঁচট খেলে, একচোখে চেয়ে দেখতে অভ্যস্ত সে কথা সে

টের পেলে না। শিবনাথকে বিয়ের দিন মন তো তার মেনে নিয়েছিল। কিন্তু একমাত্র মনের মিলে তো শেষ্ রক্ষা করতে পারা গেল না! আশ্চর্য এই যে, সে কথাটা কমলের একবারও মনে এলো না। ফাঁক তো সেদিন মনের মধ্যে কোথাও ছিল না। এ সম্বন্ধে কমলের উত্তর, যা সে অন্যত্র দিয়েছে তা, এই যে, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে ভেঙ্গে পড়ে। সত্যিকার ভালবাসা বলতে কমল কি বোঝে? ক্ষণের সত্য চিরকালীন না-ও হতে পারে—এই কি তার বক্তব্য?

কিন্তু শুধু ক্ষণের সত্যের মধ্যে জীবননাট্যের অঙ্ক শেষ করে দিলে তাতে সে-ক্ষণিক সত্য এত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে যে একমাত্র একান্ত ক্ষণিক সত্যে সমগ্র জীবন চলতেই পারবে না। কেননা ক্ষণের সত্যই তো চরম কথা নয়, চিরকালীন সত্য বলেও একটা বস্তু আছে, যা কমলের জানা নেই। আর ক্ষণও তো মাত্র একটি নয়; বহু ক্ষণে যে বহু ক্ষণসত্য আত্মপ্রকাশ করবে, তাদের মেলান যাবে কি করে? তাদের মধ্যের পারস্পরিক ঠোকাঠুকি ঠেকান যাবে কি করে? অতএব এক ক্ষণে যে সত্য, যে ভালবাসা আত্মপ্রকাশ করে, তাকে কেবল সেই ক্ষণেরই করে রাখলে সে সমগ্রতার ও বাস্তবের পরিপূর্ণ সত্য থেকে অনেক দূরে থাকে। মানুষ কি শুধু এত স্বল্প? মানুষ একাধারে স্বল্প ও বিরাট, ক্ষণিক ও চিরকালীন। তাই তো সত্যিকার ভালবাসাও যদি ভাঙে, বোঝা যাবে সে সত্যিকার ক্ষণিক ভালবাসাকে চিরকালীন করবার মহত্তর স্তর লাভের

প্রয়াস পায় নি। সেইখানে তার ব্যর্থতা। ক্ষণিকের সত্যকে চিরকালীন ও বস্তুতন্ত্র করতে গেলেই তাকে সমগ্র হতে হবে। কিন্তু কমলের পক্ষে এ বালাই ছিল না, কেননা জীবনের সমগ্রতার কোন বোধ তার মধ্যে অনুপস্থিত। সে যখন বলে সত্যিকার ভালবাসাও ভাঙে, তখন বুঝি ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী কমল প্রাণের তত্ত্বই জেনেছে, সে ক্ষণের সত্যকে চিরকালীন সত্যে পরিণত করবার কোন ইঙ্গিত, কোন পথ, কোন সাধনাই দেখতে পায় নি।

রাজেন বলেছিল হৃদয়ের মিল থাকে থাক, আমরা মতে মিল চাই, পথে মিল চাই। কমলকে যেমন আমরা রাজেনের কথা দিয়ে উত্তর দিই, রাজেনকেও একটা কথা একটু স্মরণ না করিয়ে দিয়ে পারি না। রাজার সৈন্যদলে যখন শুধু মতে ও পথে মিল, মনের মিলের তোয়াক্কা যখন তারা রাখে না, তখন তারা যন্ত্র বিশেষ। তেমন প্রাণহীন যন্ত্র দিয়ে যান্ত্রিক সভ্যতা রচিত হয়, অনেক দূর পর্যন্ত তাতে ফলও পাওয়া যায়, কিন্তু যন্ত্র দিয়ে যেমন হয় না জীবন্ত সভ্যতা রচনা তেমনি হয় না শেষ রক্ষা। সে যান্ত্রিক সভ্যতা বর্তমান পৃথিবীতে পুরনো দিনের হয়ে পড়তে চাইছে। রাজেন অবশ্য মনের মিলটাকে একেবারে অস্বীকার করে নি। কিন্তু মত ও পথের সঙ্গেই সে যে সমভাবেই অপরিহার্য, এ সত্য বোধ হয় তারও কাছে প্রকাশ পায় নি।

যাই হোক, মনের বাইরে কোন বস্তু নেই, এ বোধটা কমলের ধাতুগত। তাজমহলের নীচে বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান ঐ তাজমহলের প্রসঙ্গেও কমল বাদশার

অন্তরের আনন্দাস্বাদনের ওপরই একমাত্র জোর দিয়েছে ; মমতাজ উপলক্ষ করে সেটা বাইরে যে-অনুষ্ঠানের পথে প্রকাশ পেল, সে প্রকাশটি তার কাছে কিছুই নয়। কমল বলতে চায় যে, মমতাজের প্রতি প্রেম ও ঐ প্রকাশ-পথ তাজমহল রচনা—এ দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্কই ছিল না; ও প্রকাশ আকস্মিক। নইলে অমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র লক্ষ মানুষ বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো। কমলের বাদশার আনন্দাস্বাদ যে কোন ভাবেই প্রকাশ পেতে পারতো বটে, তবু মমতাজের প্রেম উপলক্ষ করেই তা প্রকাশ পায় কেন ?

কমল বলছে এটা আকস্মিক—কিন্তু মানুষের আত্ম-প্রকাশ কখনও আকস্মিক হয় না। যা সৃষ্ট হয়ে উঠল, তার কারণ খুঁজতে পশ্চাতের অনেকখানি গভীরে যেতে হয়। তাজমহল মমতাজের প্রতি বাদশার প্রেমের বাহ্যিক প্রকাশ—এ কথাটাকে মোটেই একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। কমলের পক্ষে বাইরের প্রকাশের ঐ পথটা কিছুই নয় বটে, কিন্তু জীবনের দিকে চেয়ে বলতে হয় কিছু ও বটেই। এমনি আরও আলোচনায় এবং তার জীবনের ঘটনাতেও অন্তরের সত্যটির যে বাইরের অনুষ্ঠানে রূপ পাওয়া অপরিহার্য, কিংবা অন্তরের সত্যকে সার্থক হতে হলে যে তাকে বাইরের মতে ও পথে মিলতে হয়, সেখানেও সত্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করতে হয়, এ কথা কমল তার প্রাণদর্শন দিয়ে স্বীকার করতে পারে নি।

কিন্তু জীবনের ঘটনায় যা সে রক্ষা করতে পারে নি, বুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে ও বলতে পেরেছে। সে যখন যুক্তি দিয়ে তর্ক করেছে, তখন অনুষ্ঠানের মূল্য সে কত সুন্দর ভাবেই না প্রমাণিত করেছে। কিন্তু তার রক্তের মধ্যে যা সহজ, তা এর বিপরীত বললেও খুব ভুল বলা হবে না।

তাজমহলের নীচে সকলের সঙ্গে আলাপে প্রথম দিনই সে বলেছে, "(অনুষ্ঠান) মিথ্যে তো বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য ; কিন্তু প্রাণ যখন যায় ?" আশুবাবু এক জায়গায় বলছেন, "সকল ধর্মমতই তো মূলতঃ এক, সিদ্ধিলাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলা। যারা মানে না বা পারে না তারা না-ই বা পারলো, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে, তাদের নিরুৎসাহ কোরেই বা লাভ কি ?" কমলের মতে সে কথা ঠিক নয়—"আচার-অনুষ্ঠানই মানুষের ধর্মের চেয়েও বড়—যেমন রাজার চেয়ে রাজার কর্মচারীর দল।"... আশুবাবু বললেন, "অথচ তোমারই যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারি অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না।" কমল বললে, "আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে তো চাই নে, চাই শুধু এর পরিবর্তন। কালের ধর্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতে চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি বলেই তো। মিথ্যে বলে জানলে মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিথ্যে শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারা জীবন মেনে মেনেই চলতুম, একটুকুও

বিদ্রোহ কোরতুম না।" অন্যত্র সে বলছে, "দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায়, তার বাইরের বাঁধনই মস্তবড় বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশি বাজে।" ভিতরকার তত্ত্ব বদল হওয়ার সাথে সাথে পুরনো অনুষ্ঠানকে ভেঙ্গে না দিলে কি ফল হয়, সে কথা বলতে গিয়ে কমল ইউরোপের রেনেশাঁসের দিনগুলির উল্লেখ করে বলেছে, "তারা সব করতে গেলো নূতন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচার-অনুষ্ঠানে। পুরনোর গায়ে টাট্‌কা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগলো তার পূজো, ভেতরে গেলো না তার শেকড়, সখের ফ্যাসান গেলো দুদিনে মিলিয়ে।"

এ সবই কমল বলেছে। আর এর প্রতিটি কথাই অত্যন্ত সত্য। ভিতরের প্রাণই যদি না থাকে, তবে প্রাণহীন, সত্যহীন একটি অবস্থাকে পুরুতের মন্ত্রের মহাজন দাঁড় করিয়ে টিকে থাকতে বলা বাস্তব নয়। বাস্তবের সত্যতা থাকে দেহ ও প্রাণ দুইকেই মিলিয়ে। ওদের মধ্যে পারস্পরিক অপেক্ষা রয়েছে। ব্যবহারিক জগতে বাস করতে বিবাহাদিরূপ অনুষ্ঠান অপরিহার্য সত্য, কিন্তু যে অনুষ্ঠানের ভিতরকার প্রাণ নষ্ট হয়ে গেছে তার স্থান কোথায়? আগেই বলেছি অন্তরের সত্যকে রূপ দিতে হলে তাকে আকারিত হতেই হবে। অনুষ্ঠানও মানি, বিবাহও মানি, কেননা ভালবাসাকে বাইরের অনুষ্ঠানে রূপ না দিলে তা ভাবুকতামাত্র। সে ভাবুকতার বাষ্পে জীবনকে পুরাপুরি সত্য করে চালান যাবেই না। ভালবাসা বস্তুটি যেমন

আন্তর ধর্ম, তেমনি দেহধর্মও বটে। বাইরে সে প্রকাশ চাইবেই। কেবল আন্তরধর্ম দিয়ে ব্যবহারের জগৎ চলে না। কিন্তু যে অনুষ্ঠানে নেই স্বতঃস্ফুরিত প্রাণধারার জ্যান্ত ভাব, তাকে শুধু একদিন হওয়ার জোরে চিরদিন চালানকে মনুষ্যধর্ম বলা চলে না। ভিতরের প্রাণ আর তার বাইরের আকার, এ দুটো এক সাথেই সত্য। আচার-অনুষ্ঠানগুলি সত্য হয়ে ওঠে প্রাণের ভিতরকার তত্ত্বকে, কথাকে, প্রাণকে অবলম্বন করেই। যে দেশে যে কালে যেমন দর্শন থাকে, যেমন তত্ত্ব থাকে, সে দেশে সেই কালে তার অনুষ্ঠানগুলিও তেমনই হয়। কালধর্মে ভিতর-কার তত্ত্বটি, দর্শনটি যদি যায় বদলে, তখনই তত্ত্বকে, দর্শনকে বাইরে রূপ দেয় যে আচার-অনুষ্ঠানগুলি, তাদেরকেও বদলে নিতেই হয়। তা না হলেই তা বীভৎস গণ্ডগোল পাকাতে থাকে।

কিন্তু ঐ সব যুক্তিপূর্ণ কথা কমল বলেইছে মাত্র, ওগুলি বেশির ভাগই তার বুদ্ধিগত বিচারমাত্র, ও তার জীবনের মধ্যে সহজ নয়, তার রক্তমাংসে ও-বুদ্ধির সহজ উপস্থিতি নেই। শিবনাথের সঙ্গে শৈব বিবাহের ব্যাপারে কিংবা অজিতের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে সে ওটার প্রয়োজনই যে স্বীকার করে, তাও সে স্পষ্ট করে নি। বুদ্ধির মধ্যে যাকে উচিত বলে বুঝতে পেরেছে, নিজের জীবনের ঘটনার বেলায় সে-বোধকে সে জাগ্রত রাখতে পারে নি। কেন সে ওদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে জোর দেয় নি, তার একটা জবাব যা

হতে পারে সে হচ্ছে যে, কমলের যা জীবন দর্শন—তার ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ—সেই দর্শনের অনুরূপ কোন আচার অনুষ্ঠান নেই বলেই সে শিবনাথের সঙ্গে শৈব বিবাহেও সম্মত ছিল, অজিতের সঙ্গে অনেক অনুরোধেও বিবাহানুষ্ঠানে যেতে সম্মত হয় নি। তেমন অনুষ্ঠান থাকলে তাতে যেতে তার আপত্তির কারণ থাকতো না।

কিন্তু প্রাণবাদী কমল যখন অনুষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করে, তখন সে যে ভাবের ঘরে চুরি করে—এ কথা তীক্ষ্ণধী তার কাছেও ধরা পড়ে নি। যে প্রাণদর্শন, যে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ তার কাছে সহজ, যা তার জীবনের ঘটনায় প্রকাশ পায় ও প্রমাণিত হয়, শুধু সেই দর্শন দিয়ে কোন অনুষ্ঠানই গড়ে উঠতে পারে না, তার কোন স্থায়িত্বধর্মই থাকতে পারে না। কিন্তু তবু যে কমল বুদ্ধির মধ্যেও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন স্বীকার করে, সে হচ্ছে নিজের সহজ প্রাণদর্শনের বাইরে অপর পক্ষের যুক্তিকে সে কিছুটা আয়ত্ত করেওছে বলে। এবং তার এই স্বীকৃতিই প্রমাণ করবে যে, রক্তমাংসে যদিও গতিই তার একমাত্র কথা—শুধু চলা, শুধু বয়ে যাওয়া, তবু মানুষের মধ্যেই যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার অন্তরের সত্যকে রূপ দেওয়ার ও ধরে রাখবার প্রচেষ্টা আছে, যা তার স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষাকে প্রমাণ করে, সে কথাও অজানিতে তারও মধ্যে উঁকি মারছিল। এই যে, কি আশুবাবু কি কমল দুজনের মধ্যেই তাঁরা যা প্রধানভাবে

নন, তা-ও থেকে যাচ্ছেই, এটা তাদের দুজনকারই অপরিহার্যতা ঘোষণা করে। এ দুয়ে মিলে যে একটা সমন্বয় বা সংশ্লেষণ (synthesis) অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক— এ তা-ও দ্যোতনা করছে।

ক্ষণিকের বর্তমানভজনের এক পক্ষকে আশ্রয় করে কোন অনুষ্ঠানই দাঁড়াতে পারে না। যে স্মৃতি স্বীকার করে না, যার কাছে সম্পর্ক ছিঁড়লে ছিঁড়েই যায়, কোনমতেই আর জোড়া লাগে না, মনের মিলেই যার একান্ত বিশ্বাস ও ভরসা, মত ও পথ যার কাছে বাহুল্য মাত্র, সে অনুষ্ঠান গড়ে তুলবে কি দিয়ে? শুধু কি বিস্মৃতির শূন্যতায়? হয় না। একান্ত স্থায়িত্বধর্মকে প্রধান করে তুলে তবু বা কোন অনুষ্ঠান, কোন সভ্যতা দাঁড়াতে পারে, যত অঙ্গহীনতার কুশ্রীতাই তার থাকুক না কেন, কিন্তু একান্ত গতিধর্মের উপর, একান্ত বদলে যাওয়ার সত্যের উপর, একান্ত মনের মিলের উপর কোন বস্তু দাঁড়াবে কি করে, রূপায়িত, আকারিত হয়ে উঠবে সে কোন্ বস্তু অবলম্বন করে? কিন্তু একথা কমল ধরতে পারে নি। কমল নদীর নিত্য পরিবর্তনশীল স্রোতধারাকে মানছে, কিন্তু দুই তীরের অস্তিত্বের যে বন্ধন দিয়ে নদীসত্তা গড়ে ওঠে তাকে না মানার দরুণ নদীসত্তা যে শূন্য হয়ে যায় সে কথাটা তার বুদ্ধিতে আসছে না। তাই তো বলতে হয় এক পক্ষে ভর করে বিপ্লবের পথে কমল বেশি দূর এগোতে পারে নি এবং পারবে না।

মানুষবস্তুটি শুধু মন নিয়েই নয়। তার অনেক হাঙ্গামা আছে। মনে মিললেই জীবনের ষোল আনা কাজ চলে না। মানুষের মত আছে, পথ আছে, আবেষ্টন আছে, কর্ম আছে। একের সঙ্গে অপরের শুধু মনের মিলে জীবনের রসাস্বাদন বাস্তব হয় না, সেখানে দুটি সত্তার মিলন-উৎসবে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় না; কেবলমাত্র অন্তঃস্যূত ভাব দিয়ে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষুধা মেটে না। তাইতেই তো ভালবাসা ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। ভাবের মিলনকে সার্থক করতে হলে বাইরে তাকে রূপ দিতেই হয়; এবং বাইরে রূপ দিতে গেলে মানুষের সঙ্গে মতের মিলেরও দরকার, পথেরও। নইলে যে অ-ভাবের বিরুদ্ধ হাওয়া বইতে থাকে, শুধু তা-ই নয়, ভিন্নতর আবেষ্টনে মানুষকে বিভিন্ন পথে টেনে নিয়ে যায়, যাতে মনের মিল খুব বেশি হলে একটা সত্তামাত্রে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। দুটি সত্তার মিলনকে সর্বাঙ্গীন আস্বাদন করতে গেলে তাদেরকে ভাবে মিলতে হয়, মতে ও পথে মিলতে হয়, কর্মে মিলতে হয়, দ্রব্যে মিলতে হয়; তা হলেই ভেতরে বাইরে সামঞ্জস্য থাকে, তা হলেই ক্ষণের সত্য চিরকালীন সত্য হওয়ার পথে অগ্রসর হয়, আর তা হলেই সত্যিকার ভালবাসারও পরবর্তী ক্ষণে ভেঙ্গে পড়বার অভিনয় ঘটতে থাকে না।

রাজেনের দর্শনই কমলকে বিস্মিত করেছিল; রাজেনের কাছ থেকে মত ও পথের মন্তব্য তাকে বিস্মিততর করেছিল। এখানেই শেষ নয়। কমল রাজেনকে বলেছিল তাকে বন্ধু বলে জানতে। এর উত্তরে রাজেনের মন্তব্য শুনে সে বিস্মিত হয়েছিল,

ব্যথিত হয়েছিল। "কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা, তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভাণ করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।"

বিপ্লবিকর্মী রাজেনের কাছে কমলের এই পরাজয় তার জীবনের এই দৈন্যকেই ফুটিয়ে তুললো যে সে কর্মী নয়, সৃষ্টি করবার সামর্থ্য তার নেই। অজিত-হরেনের পক্ষে কর্মের বালাই ছিল না, তাদের ভাবুকতার মধ্যে তাই কমলের বিশেষ স্থানলাভ ঘটেছিল। কিন্তু বিপ্লবী ও সেই সঙ্গেই কর্মী রাজেনের কাছে শুধু মতবাদের কাণাকড়ি মূল্যও নেই। তাই কমলের রূপগৌরব বা তার মতবাদের বিশিষ্টতা রাজেনকে মুগ্ধ করতে পারে নি। তাই তার বন্ধুত্বের প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যানে কমল অমন দৈন্যের গ্লানি অনুভব করেছে।

রাজেন বলেছিল মত ও পথই তার কাছে প্রথম সত্য। এই কথাটিই তার জীবনের শেষ কর্মটি দিয়ে সে গভীর ভাবে প্রমাণ

করে দিয়ে গেছে। আকার তার কাছে অত্যন্ত সত্য বলেই জ্বলন্ত বিগ্রহকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ও সার্থক হয়েছিল। কিন্তু এজন্য কমলের দিক থেকে দারুণ অভিযোগ এল। টেলিগ্রামে খবর শুনে সে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে।...কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি কোরেই আদায় হয়।" জ্যান্ত মানুষের জীবন দিয়ে বিগ্রহের উদ্ধার করতে যাওয়া ও এইভাবে ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া কমলের কাছে অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। কিন্তু ভগবানের আকার আজ আর মিথ্যা বস্তুতন্ত্রহীন পদার্থমাত্র নয়।

আজকের শেষ দর্শনশাস্ত্র বলছে আকার সত্য। বিগ্রহ ভগবানের আকার, অতএব তা সত্য। অন্তরের ভাব যখন ঘন হয়ে ওঠে, তখনই তা আকারিত হয়ে প্রকাশ পেতে চাইবেই। অনন্ত ভাবের আকর ভগবান কোন একটি বিশেষ বিশেষ ভাবের মধ্যে মানুষের কাছে রূপ পান—কোথাও ধ্বংসের দেবতারূপে তিনি রুদ্র শিব, কোথাও বিশ্বের রস-মাধুর্যের খনিরূপে তিনি পোষণমূর্তি সরস্বতী, এমনি আরও কত কি। এর অন্তর্নিহিত ভাব যেমন সত্য, যে আকারে তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে, তা-ও তেমনই সত্য।

কেউ বলবে ধর্মের জন্যই মানুষ, কেউ বলবে মানুষের জন্যই ধর্ম। কমল এক জায়গায় বলেছে, "ভাবের জন্য, বিশেষত্বের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার সমাদর, মানুষের জন্যই

তার দাম। মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়?" মানুষই সব চেয়ে বড় কথা সে সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই মানুষ হচ্ছে মানুষ যা আছে এবং মানুষ যা হতে পারে—এই দুইয়ে মিলিয়ে মানুষ যা, সেই মানুষ। এই হতে পারার ব্যাপার মনুষ্য-জীবনে চিরকালই আছে ও থাকবে। তাই ভাব, তত্ত্ব ও বিশেষত্বের সৃষ্টি। শুধু ভাবের জন্য, ধর্মের জন্যই মানুষ নয়, শুধু মানুষের জন্যও ভাব নয়, ধর্ম নয়। যদি ভাবের জন্য, ধর্মের জন্যই শুধু মানুষ হয়, তবে পরিবর্তনধর্মশীল মানুষের সেখানে কোন অর্থই থাকে না। আবার যদি মানুষের জন্যই শুধু ধর্ম বা ভাব হয়, তবে তা সুবিধাবাদে পরিণত হতেও খুব বেশি সময় নেয় না। এ হেন সুবিধাবাদের ধর্ম মনুষ্যধর্ম বলে মানা চলতেই পারে না। যেখানে প্রত্যেকে নিজের জন্য এবং প্রত্যেকে পরস্পরের জন্য, সেখানেই শোষণ স্তব্ধ, অনুপস্থিত।

তেমনি প্রতি মানুষই যদি সে যা আছে, তাকেই বিচারের একমাত্র নিশানা ধরে, তবে মানুষের হতে পারার কোন সার্থকতাই আর থাকে না। মানুষের হওয়া ও হতে পারার সকল সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে যেমন ভাব-তত্ত্বকে গড়তে হবে, তেমনি সেই গঠিত ভাব-তত্ত্বের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে না পারলে পারস্পরিক হানাহানির নারকীয় দৃশ্যের অভিনয় হতে থাকবে, মানুষের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত মহিমা যাবে ধূলিসাৎ হয়ে। তখন

যেমন ভাবের জীবন্তত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, তেমনি মানুষেরও। ভাব, তত্ত্ব বা মানুষ—কোনটাই একান্ত মুখ্য বা একান্ত গৌণ নয়। প্রত্যেকটিই মুখ্য দেশকালপাত্রানুযায়ী। মানুষকে তলিয়ে দিয়ে তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠা নয়, মানুষের বিরতিহীন অগ্রগতির জন্যই তত্ত্বের অনুগমন। তত্ত্ব যদি মনুষ্যধর্মবিবর্জিত কাল্পনিক আকাশ-কুসুম না হয়, মানুষের সকল বাস্তব হওয়া ও হতে পারার সমন্বয়েই যদি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, তবে মানুষের মনুষ্যত্বকে সার্থক করবার জন্যই তত্ত্বের অনুসরণ।

বিগ্রহের জন্য মানুষের জীবন দেওয়া চলেই না—এ যেমন অর্থহীন, তেমনি সর্ব দেশকালপাত্রেই বিগ্রহের জন্য জীবন দিতেই হবে, এ-ও সত্য নয়। উচিত-অনুচিত কর্তব্যাকর্তব্যের তথাকথিত প্রচলিত অভিধানে যে বিধান দেওয়া হয়ে আছে, জীবনের মধ্যে এসে তার হাজারখানা মানে হয়ে যায়। সেই হাজারখানার মধ্যে কোন্ দেশকালপাত্রে কোন্ মানেটা প্রযোজ্য বা গ্রহণীয়, সেইটে বের করে নিতে হয় স্বরূপ ও আবেষ্টন দেখে, আর সেইটেই ছন্দ। রাজেন যখন ধর্মের জন্য, বিগ্রহের জন্য তার জ্যান্ত প্রাণটি বিসর্জন দিয়েছিল, তখন তার এত সব উপলব্ধি ছিল কি না তার স্পষ্ট প্রমাণ নেই। তার অতীত সম্বন্ধে যতটা পরিচয় আমরা জানি, তা দিয়ে এ অনুভূতি তার আসতেই পারে না এমন কথা সত্য নয়, তবে সচেতনভাবে এ তত্ত্ব সে উপলব্ধি করেছিল বলেও স্পষ্ট বলা হয়তো চলে না। তবুও বলতে হয় রাজেন কর্মী, মত ও পথ তার কাছে মস্ত বড় কথা ; তাই আকার

তার কাছে মিথ্যা তো নয়ই, অত্যন্ত সত্য বস্তু। দেবতার প্রাণের অপেক্ষা দেবতার আকার তার কাছে বরং বেশি সত্য; তাই বিগ্রহকে মান না দিয়ে তার পক্ষে উপায় ছিল না। ওদিকে কমলের কাছে নিরাকার মন সত্য, আকারস্থানীয় মত ও পথ তার পক্ষে অর্থহীন। তাই কমলের মত এ রায় আমরা দিয়ে দিতে পারলাম না যে, বিগ্রহকে আগুনের গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে নিজের প্রাণ দেওয়ায় রাজেন অজ্ঞানের বলিই শুধু হয়েছে, এর কোন সার্থকতাই ছিল না।

শেষপ্রশ্নের মধ্যে আমরা চারিটি নারী-চরিত্র পাই—কমল, মনোরমা, নীলিমা ও বেলা। কমল জীবনের কোন্ দিককে প্রকাশ করছে, সে কথা আমরা পরিষ্কার করেই বলতে চেষ্টা করে আসছি। এইখানে কমল সম্বন্ধে একটি ছোট্ট অথচ বিশেষ কথা বলব। শরৎচন্দ্র তাঁর কমলকে যে জন্ম পরিচয় দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে অন্ততঃ দুই একবার নাক না সিটকিয়ে আমরা পারব না। এ অদ্ভুত ব্যবস্থা শরৎচন্দ্র কেন করলেন? এর সংক্ষেপ ও সহজ উত্তর এই যে, শরৎচন্দ্র প্রাচ্য ও প্রতীচী এই দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত অপরিহার্য অংশকে মেলাতে চেয়েছেন; তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের জন্মের মধ্যেও তিনি সে কথাটা প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ কমল প্রচার করেছে, আমাদের দেশের ছিদ্রবিহীন চিরাচরিত ব্যবস্থার সঙ্গে তা এতই বেখাপ যে, এ সত্য যাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক, আংশিক-

ভাবে তাদেরই একজনকার মধ্য দিয়ে এ কথা প্রথম বলতে চাওয়ার প্রয়াস সঙ্গতই হয়েছে। প্রায় অসূর্যম্পশ্যা ভারতীয় নারীর রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে এ তত্ত্ব প্রবেশের পথ কোথায়? তাই প্রথম উপস্থাপকের পক্ষে এমন সংমিশ্রণের পটভূমিকা স্বাভাবিক হয়েছে এবং সমস্ত ঘটনাটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্যও করেছে।

মনোরমা সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছু নেই। শিবনাথকে দেখে তার ভাল লেগেছিল, শিবনাথের গান শুনে সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। "সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যটা সঙ্গীতের ছন্দে টন্ টন্ করিতে থাকে তাহা সে জানিত না।" একদিন শিবনাথের কাহিনী শোনামাত্র এই মনোরমার যে পরিমাণ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অরুচির সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এক সময়ে শিবনাথের প্রতি সে সহজেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে—মনস্তত্ত্বের এ স্বাভবিক ও সাধারণ পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজনহীন। মনোরমার মধ্যে কোন চিন্তাধারার সম্পদ ছিল না। সে গড্ডালিকাস্রোতে পড়ে তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিল, গান বাজনার চর্চা করেছিল, বাইরের অনাত্মীয়ের সঙ্গে সহজে মিশেছিল। কিন্তু এর কোন কিছুরই পশ্চাতে তার কোন চিন্তা, কোন বিদ্রোহ-বিপ্লবের সচেতনতা ছিল না। অজিতের সঙ্গে বিয়ে তার হত হতে হয় নি। সেই না-হওয়াকে সে হওয়া বলেই ধরে নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বৎসরের বিচ্ছেদকে টেনে এসেছে। কিন্তু বিচ্ছেদের

ব্যবধানের মধ্য দিয়ে নাড়ীর টান কখন যে গলে পড়ে গিয়েছিল, বিচ্ছেদের অভ্যস্ত বিধিপথে চলার নেশায় মশগুল সে কথা মনোরমা এবং হয়তো অজিতও টের পায় নি। অজিতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই মানসিক সম্মতি ও খানিকটা অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ সম্পর্কের নিশানা ধরে নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর কাটিয়ে দেওয়া কঠিন হয় নি। কিন্তু অজিত যখন প্রত্যক্ষ এসে দাঁড়াল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই এসে দাঁড়াল শিবনাথ, তখন প্রত্যক্ষ অজিতও সম্বন্ধের ভাঙ্গনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

মনোরমার অন্তস্তলে রয়েছে পুরনো কালের স্থিতিপ্রধান নীতিবোধ। কমলের ধারণা, তার কাজকর্ম, কথাবার্তা যে একমাত্র কমলেতেই সম্ভব ও স্বাভাবিক, একথা কমলকে শুনিয়ে দিতেও সে ছাড়ে না, মিটিং করে কমলকে প্রতিবাদ জানিয়ে তাকে নিন্দনীয় করতেও তার দ্বিধা নেই। তবু নিজে যে কেন সে অজিতকে নিঃশব্দে ত্যাগ করে এসে একদিনকার অরুচিকর শিবনাথকে দেহমনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করল, নিজের সে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সে অবহিতও নয়, সে সম্বন্ধে তার কোন যুক্তিও নেই। কিন্তু কমল তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সম্বন্ধে সচেতন এবং সে সম্বন্ধে ঐকদেশিক হলেও ধারাল যুক্তির শান দেওয়া পথে সে পা ফেলে। কমলের অন্তরের নীতিবোধ ও ঔচিত্যবোধের সঙ্গে যা সে চায়

যা করে, তার কোন অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য ছিল না। এজন্য নিজেকে কিংবা অপরকে সে ফাঁকি দেয় নি। সমগ্র জীবনের মধ্যে প্রাণের স্থান ও মান নির্দেশে সে ঐকান্তিক ও ঐকদেশিক হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু প্রাণের জয়যাত্রাকেই তার বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিয়ে সে যেমন তার প্রথমের সঙ্গে শেষের সামঞ্জস্যর অভাব ঘটায় নি, তেমনি তার মধ্যে সততার অভাবও ছিল না কোনখানে। তার শেষ পরিণতি যা আমরা দেখিয়েছি, সেটা তার ঐকান্তিক প্রাণধর্মের অনুষ্ঠানের ক্লান্তি, অন্য কিছু নয়। জীবনের মধ্যে প্রাণের দাবি, তার স্থান ও মানকে তার স্বয়ংমূল্যে, তার স্বাতন্ত্র্যে সে স্বীকার করতে পেরেছিল, শুধু তার যথাস্থান নির্দেশ করতে পারে নি। কিন্তু প্রাণের এই সত্য দাবিকে মনোরমা সত্য বলেই জানতে শেখে নি। অথচ তার চলন কিন্তু প্রাণের উগ্রতম বিকৃতির পরিচায়ক। এইখানেই কমলের সঙ্গে মনোরমার আকাশপাতাল তফাৎ। সে যখন অজিতকে ধরে রেখেছিল, তখন তার একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে যখন শিবনাথকে গ্রহণ করে, তখন তার মধ্যের বহুত্বের প্রকাশ ফুটে বেরোয়। কিন্তু তার এই একনিষ্ঠা বা বহুনিষ্ঠা কোনটারই কোন সঙ্গত কারণ নেই; এবং আমাদের কাছে কোন দীপ্তি নিয়েই সে এসে দাঁড়ায় না।

স্বামী দুশ্চরিত্র বলে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য স্বামীকে বেলা

ত্যাগ করেছিল আইনের সাহায্য নিয়ে এবং সেই আইনের সাহায্যেই স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষও সে আদায় করে নিয়েছিল। নীলিমা বলেছে, দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যই থাক, বেলার স্বামী ত্যাগের মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যও যে নেই, এ কথা সে জোর করেই বলতে পারে। কমলের সঙ্গে বেলার পার্থক্য কোথায়? বেলার সঙ্গে কমলের তুলনা করা হয়েছিল বলে নীলিমা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। নীলিমাই এর উত্তর দিয়েছে। সে বলেছে যে, নারীর স্বাধীনতার কথা আজ সকলের মুখে মুখে, এবং নারীর দুঃখদৈন্যের সাক্ষ্য সে নিজেই। তবু কমলকে দেখবার আগে এ দুটোর কোনটারই আসল রূপটি তার কাছে স্পষ্ট ছিল না। বাস্তব স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারপ্রাপ্ত নারীজীবনের কোন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে না দেখতে পেলে তার উপলব্ধি বাস্তব হয় না।

বেলার স্বাধিকারপ্রিয়তা অপরকে আঘাত করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। তাই আইনের সাহায্যে সকলের সামনে স্বামীর দুশ্চরিত্রতা প্রমাণ করে দিতেও তার পীড়া বোধ হয় না, এবং সেই দুশ্চরিত্র পরিত্যক্ত স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ আদায় করে তাই দিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতেও সে লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু কমলের স্বাতন্ত্র্য অপরকে আঘাত করার মনোবৃত্তি রাখে না। আপন আত্মার বিস্তারে আপনি সে বেড়ে ওঠে, অপরকে

আঘাত হানবার দরকারই হয় না। শিবনাথকে হরেন্দ্রের দল শাস্তি দিতে উদ্যত হলে বার বার আকুল ভাবে সে তার বিরোধিতা করেছে। শিবনাথের সঙ্গে শেষ দিনের আলাপে সে তাকে বলেছে "তোমার মঙ্গল হোক্, এ আমি আজও চাই।" নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারবোধের ধারণা বেলা আর কমলের অনেক পৃথক।

কাজকর্ম না করে ঘুরে বেড়ানটাই স্বাধীনতা নয়। কমলের সম্বন্ধে নীলিমা বলছে যে, সে যে এমন কিছুই করতে পারে না, যাতে তার মর্যাদা হানি হয়, এ কথা সবাই জানতো। আর দুইচারিটি কথা শোনবার পর বেলা জিজ্ঞাসা করছে, "স্বামী থাকলে সে কি করতো?" এর উত্তরের শেষ দিকটায় নীলিমা বলছে, কাজকর্মের মধ্যে "সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতো না।" শুনে বেলা বললে, "তবে?" নীলিমা উত্তর দিল, "কাজকর্ম কোরব না, শোকদুঃখ অভাব অভিযোগ থাকবে না, হরদম্ ঘুরে বেড়াবো—এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার তো কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি?" স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই, অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই যে কর্তব্য বলে, কাজ-করা বলে একটা জিনিষ অঙ্গাঙ্গিভাবে এসে যায়—এ কথাটা বেলার বোধে আসে নি। মেয়েরা এতদিন কাজ করেছে, অতএব আজ না-করা—এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড? একটু আগে নীলিমা

বলেছে "মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নরনারীর মুখে মুখে কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক পা এগোয় না।···স্বাধীনতা তত্ত্ববিচারে মেলে না, ন্যায় ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলে না,—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না,—দেনাপাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখলেই দেখা যায়, "এ নিজের পূর্ণতার, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুক্‌রে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না,—মরে।" বেলার সঙ্গে, অন্যের সঙ্গে কমলের তফাৎ ঐখানে।

বেলামালিনী তথাকথিত অভিজাত-সম্প্রদায়ের, স্বাধীন চলাফেরা, তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষা—কিছুরই তাদের অভাব নেই। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলাফেরা, বেশ ভূষায় তারা আপ-টু-ডেট। এই-ই তাদের পুঁজি। কিন্তু বাইরের এই আড়ম্বরের পশ্চাতে তাদের অন্তরের দৈন্য ফুটে বের হতে দেরী হয় না। স্বাধীন চলাফেরার মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা ও মূল্যবোধ জেগে ওঠে নি—তা উঠলে অপরের সঙ্গে রেষারেষির বিরোধ তাদের আপনা আপনিই খসে পড়ত। নিজের সত্য মূল্য যে জানতে পেরেছে, অন্যের সত্য মূল্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে সে সক্ষম। শেষ দিনের শেষ বৈঠক থেকে উঠে যাবার সময় বেলামালিনী কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কোন অভিবাদন না করেই

চলে গেল। স্পষ্ট অবজ্ঞা ও উপেক্ষার অপমান সকলের কাছেই বিসদৃশ ঠেকল। ওদের হয়ে আশুবাবু কমলকে বললেন, "কিছু মনে কোরো না মা, এ ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই।···রাগ করলেও ওঁদের প্রতি অবিচার হয়।" আমাদের সমাজের তথাকথিত শিক্ষিতেরা—স্বাধীনতা স্বাধিকারের যারা গর্ব করে—তারা বহুলাংশেই ভেতরের থেকে জীবন নিয়ে বেড়ে ওঠে নি সমগ্র সত্তায়, ডিমের খোলা ঠুক্‌রে ভেঙ্গে যেন ওদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে যে ওরা মানুষ হিসেবে বেঁচে নেই, মরে গেছে, এ বোধ আজও তাদের জাগে নি।

সমস্ত কাহিনীর মধ্যে নীলিমার স্থান কোথায় তার আভাস আগে আমরা দিয়েছি। নারীকে নিঃশেষে পুরুষের মধ্যে মুছে ফেলে দেওয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর দুর্ভাগ্য কত বড় ভয়াবহ হতে পারে, মানুষের জীবনধর্মের কাছে সে যে কতবড় শূন্যতার জয়নাদ ঘোষণা করতে থাকে, নীলিমা তারই একটি সংক্ষেপ দৃষ্টান্ত। যে অবিনাশবাবুর সংসার দেখতে এসে একদিন নীলিমার পক্ষে সবদিকের দরজাই শাস্ত্রীয় আইনে বন্ধ হয়ে গেল, সেই অবিনাশবাবুর মনে বায়ু-পরিবর্তনের সময় নীলিমার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠল না, সেই অবিনাশবাবুর হৃত স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর দাদাবৌদির অনুরোধ রক্ষায় একটি বিয়ে করে ফেলতেও আটকাল না, নীলিমার কথা হয়তো তাঁর মনেই আসে নি। অথচ এই অবিনাশবাবুই

বিধবার ব্রহ্মচর্যের গুণগানে শতমুখ ছিলেন। যে সমাজ এমন করেই মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদায় অপমানের, অনাদরের বাণ হেনেছে, সে সমাজ যত শীঘ্র ধূলিসাৎ হয়, সমস্ত মানব সমাজের পক্ষে ততই কল্যাণ।

নীলিমার নিপীড়িত আত্মা কমলকে বুঝেছিল। কাহিনীর অন্যান্য নারীরা কমলকে উপেক্ষা করেছে, বিদ্রূপ করেছে কিন্তু নীলিমা কমলকে ভালবেসেছিল। আশুবাবু বলেছেন কমলকে, "...জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি করে চেয়ে থাকে তো এই নীলিমা। এতখানি ভালোবাসা হয়ত তুমি কারো কখনো পাও নি কমল।"

মনোরমা বেলা মালিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে লেখক সৃষ্টি করেছেন কেন? প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে এরা মানে না; অথচ নূতন যুগের যে হাওয়া এদের মধ্যে এসে গেছে তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধেও এরা যেমন সচেতন নয় তেমনি সেখানে কোন স্থিতিও এরা লাভ করতে পায় নি। তাই এরা ডাইনেও নেই, বাঁয়েও নেই। এরা যা করে তার অর্থ জানে না, তার ব্যাখ্যাও দিতে পারে না। অন্তরে যা উচিত বোধ করে, তা করেও না, করতে পারেও না। এরা হৃদয়ের চাওয়া আর বুদ্ধির বিচারকে মেলাতে পারে না একেবারেই। এদের মধ্যে জীবনের যে কথাটা এসে গেছে, যেটাই হচ্ছে প্রাণধর্ম, সেটার সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়, তাই তাদের চিন্তায় ও কাজে অসঙ্গতি ও দ্বন্দ্বের শেষ নেই। এই

অবস্থাটাই ইঙ্গিত করছে একটি সমন্বয়ের, একটি সংশ্লেষণের। পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নীলিমা কি-ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, তা লেখক উজ্জ্বল করে দেখালেন, সেই ব্যবস্থারই একেবারে বিরুদ্ধ পক্ষ হয়ে কমলও কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল তা-ও লেখক দেখিয়েছেন এবং এই দুটোর মাঝখানে থেকে যেখানে ও দুটোর কোনটাই তত্ত্বতঃ ঠিক নেই, বিকৃত হয়ে গেছে, সেখানে মনোরমাদের ব্যর্থতাও তিনি আমাদের জানালেন। এই সব কিছুর মধ্য থেকে এই ইঙ্গিতটিই ফুটে উঠছে যে, এই দুটো দিককেই তত্ত্বতঃ সার্থক করে দুইয়েরই পরিমিতির মধ্যে আর একটি অবস্থা আছে। ভবিষ্য যুগ সেই সংশ্লেষণের দিকে চলেছে।

সমস্ত কাহিনীর মধ্যে হরেন্দ্র একটু ছোট্ট অবকাশ। কমলের মত সে বুঝতো না, তবু কমলকে প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত কখনও সে অপমান করে নি। বিরুদ্ধ মতকেও শ্রদ্ধা করতে পারার একটি প্রীতির, একটু প্রাণের অবকাশ ছিল তার মধ্যে। লেখক বলেছেন, "নরনারী নির্বিশেষে সকলের পরেই হরেন্দ্রের একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল,—এই জন্যেই দেশের ও দশের কল্যাণের সর্বপ্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব কিছু ভাগ করিয়া লওয়া—এ সকলের মূলেই ছিল ঐ একটি মাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে

কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল।" কিন্তু হরেন্দ্র নিজে বলছে এক জায়গায়, "কিন্তু আমার সব চেয়ে রাগ হয়, ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক অনুশাসন, সব কিছুকেই উপহাস কোরে উড়িয়ে দিতে চায়।" দেশকে ও দেশের মানুষকে হরেন ভালবেসেছিল, এজন্য তার সকল শক্তি নিয়োজিতও করেছিল কিন্তু পথ চলার ঠিক নিশানাটি পায় নি। ভারতের অতীত বলতে, তার ঐতিহ্য বলতে যা সে বুঝে ও বুঝিয়ে এসেছে, সেই তাকেই পুনরুজ্জীবিত করে ভারতের সমস্যা সমাধানের কোন সম্ভাবনাই যে আজ নেই, অথচ ভবিষ্য যুগের চলার তত্ত্বও যে ভারতের গীতা উপনিষদেই কেমন করে রয়ে গেছে—তা তার কাছে ধরা পড়ে নি। তাই তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না; তাই আশ্রম রেখেও যেমন সে আনন্দ পাচ্ছিল না, তুলে দিয়েও তার সোয়াস্তি মেলে নি। ঐ আশ্রমে কৃচ্ছ্র,তার যে আদর্শ দিয়ে হরেন্দ্র তার ছেলেদের গড়ে তুলছিল, তা যে ভারতকে ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, ভূতি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য দিতে পারবে না—একথা আমরা বহু স্থানেই উল্লেখ করে আসছি, এখানে পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

অনেক দিকে পরিভ্রমণ করে আমরা আমাদের সমালোচনার ধারার মূল সূত্রটিতে ফিরে আসি।

কমলের প্রাণধর্মের বক্তব্য, তার অপরিহার্যতার কথা আমরা বলেছি। এবং এ-ও দেখিয়েছি যে কমলের ঐ প্রাণধর্ম তার জীবনের মধ্যে সহজ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সমগ্র জীবনের বাতায়ন থেকে কমলের ঐ ঐকদেশিক প্রাণধর্ম যে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, সকল মহিমা নিয়েও যে সে দাঁড়াতে পারে না, সেই কথাটি আমরা আগেই কিছু উল্লেখ করে এসেছি, এখন তা স্পষ্ট করে দেখাবার চেষ্টা করব।

কমল বলেছিল বটে যে, বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে এ জীবনের সুখ-দুঃখে মেশানো চলমান ক্ষণগুলিকে আস্বাদনের ছন্দই জীবন—এ ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়; কিন্তু হৃদয়ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধির ধর্মকেও সমন্বিত করে তার ছন্দ বের করে নিয়ে চলতে সে পারে নি। প্রাণের স্বধর্ম যেমন সে চলবে নব নব আস্বাদনের পথে, বুদ্ধির স্বধর্ম সে তার মধ্যে সঙ্গতি আনবে, সামঞ্জস্য আনবে, সমস্ত বহুর মধ্যে বিধৃত যে এক সেই একেকে চলার ছন্দে গেঁথে দেবে। বহুকে অস্বীকার করে যে ঐক্য আনবার চেষ্টা এতদিন ধরে সে করে এসেছে আজ আর সে ঐক্য আনবে না, বহুর স্বীকৃতির মধ্যেই তার অন্তর্নিহিত একেকে বের করবে। কিন্তু কমল তো ক্ষণের সঙ্গে চিরকালীনত্বের, একের সঙ্গে বহুর ঐক্য বের করে চলে নি। ক্ষণের নিজস্ব আস্বাদন পর্যন্ত সে বোঝে, কিন্তু ক্ষণের ভেতরেও যে একটি চিরকালীনত্ব রয়েছে, যেমন রয়েছে তার বাইরেও, সে খবর তো কমল পায় নি। ক্ষণের নিজস্ব আস্বাদনের সঙ্গেই সর্বক্ষণসমন্বিত ও সর্বক্ষণাতীত যে

একটি সত্য আস্বাদন আছে, সে কথা কমল জানতে পায় নি। কমল বলেছে দুঃখের বিপ্লব সংসারে এনে দেওয়াই তার ধর্ম। কিন্তু কোন ঐকদেশিক মতবাদই তো কোন কিছু সত্য করে গড়ে তুলতে পারে না! কমল জীবনের এক সত্যকে প্রচার করেছে বটে, কিন্তু সে সত্য তার মধ্যে প্রধানতঃ একান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে কিছুই সে গড়ে নিতে পারে নি। বিপ্লব সে আনেনি, প্রচলিত চিন্তাধারার অনমনধর্মশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করেছে। বিদ্রোহ শুধুই ধ্বংসাত্মক; বিপ্লবের একদিকে ধ্বংস, আর সেই সঙ্গেই তার গড়ে তোলা। কিন্তু কমল তো সৃষ্টি করতে পারে নি। যে মতবাদ সে প্রচার করেছে, তাকে আস্বাদন করবার গৌরবে একদিক দিয়ে সে উজ্জ্বল বটে, তবু ঐ গড়ে না নিতে পারার ক্লৈব্যে সে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। কোন কিছুই যখন ঐকদেশিক বা একান্ত হয়ে ওঠে, তখনই তা অসুন্দর, তখনই তা অত্যাচার, তখনই তা অপরকে আঘাত করে। আর তখনই তা সমস্ত সৃষ্টি-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ক্লীব হয়ে দাঁড়ায়,—কি বুদ্ধিবৃত্তি, কি হৃদয়ধর্ম দুইয়ের পক্ষেই একথা সত্য। আমরা যে আজ শক্তিহীন, সংঘহীন ক্লীব সত্তামাত্রে পর্যবসিত হয়েছি, তার মূলেও ঐ। নূতনতর ভবিষ্যৎকে সামাল দেওয়ার শক্তি আমাদের সভ্যতা আমাদের দিচ্ছে না। জড়বাদকে হজম করে তাই অজড়বাদী হওয়ার আহ্বান এসেছে আজ, জড়বাদকে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা ভয়ে পরিত্যাগ করে বা এড়িয়ে চলে নয়।

একান্ত হৃদয়ধর্ম, একান্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ শুধু বর্তমানের উপাসক ; ভবিষ্যৎ সে স্বীকার করে বটে কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি তার নেই। তার কাছে আগতম্ আগতম্, অনাগতম্ অনাগতম্—যখন যা আসবে, তখন তা আসবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে মিলিয়ে চলবার বোধ বুদ্ধি তার আসে না। তাই ওতে সত্যিকার কিছু সৃষ্টি সম্ভব নয়।

কমলের মধ্যে যে সংযম আত্মপ্রকাশ করেছে, তা প্রাণ-ধর্মেরই সংযম, সহজ জীবনপ্রবাহের সংযম নয়। সে বলেছিল বটে এবং বুদ্ধিতেও বুঝতো হয়তো যে, কেবলমাত্র ভোগকেই বড় করে তুলে কোন জাত কোনদিন বড় হতে পারে না এবং এ যে-কেউ কোনদিন ভুলবে, সেদিনই তার বড় হওয়া যাবে ঘুচে ; এবং এ কথাও সে বলেছিল যে "এর (ভোগের) আসল সত্তা তো বাইরের ভোগের মধ্যে নেই, উৎস ওর 'জীবনের মূল্য' ; ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগান দেয়।" তবু একথাও অত্যন্ত সত্য যে, শুধু ভোগ হিসেবেই ভোগের মূল্য যাচাই না করে তাকে 'জীবনের মূল্য' দিয়েও যাচাই করে নেওয়া কমলের জীবনে সহজ ছিল না। তার প্রধান প্রমাণ যে, কাউকে সে সৃষ্টি করে নিতে পারে নি। শিবনাথ সেই তাজমহলের নীচে তাকে প্রথমেই আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়া মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে বলেছিল। আশুবাবুর মধ্যে একের প্রতি যে নিষ্ঠা, সে নিষ্ঠার স্থিতি কমলের ছিল না ; শিবনাথ সে না-থাকার অভাব বোধ করেছিল।

সে স্থিতি কমলের ছিল না বলেই তো শিবনাথকে সে ছাড়তে পারল অত সহজেই। শিবনাথের তাকে পরিত্যাগ সে যত সহজে নিয়েছে, সেটা প্রাণধর্মেরই ছন্দ, জীবনের নয়। প্রাণ কেবলই এগিয়ে চলে, পেছনের দিকে চেয়ে দেখা তার ধর্ম নয় একেবারেই। সহজ জীবনও কোন fixation, কোন আটকে পড়াই স্বীকার করে না বটে, কিন্তু অত সহজে কাউকে সে ছাড়তেও পারে না। ব্যথা বাজে অনেক বেশি। কেবল ব্যথাই যে বাজে নিবিড় করে তা-ও নয়, তাকে সে একেবারে নিজের মধ্যের থেকে অনুপস্থিত করে দিতেও পারে না। একমাত্র প্রাণের সচলতাকে স্বীকার করার দরুণ, শুধু ক্ষণিক সত্যের পূজারী হওয়ার দরুণ, ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের সূত্রকে কমল গেঁথে তুলতে পারে নি। পারলে প্রজ্ঞা-প্রাণ সমন্বিত সত্তায় মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সংঘাত আরও অনেক বেশি হতো; তার বৈচিত্র্যও যেমন বহুধা হতো, তার গভীরতার সীমাহীনতাও অনেক দূর ছাড়িয়ে যেত। এখানে কমল হয়ে পড়েছে নেহাৎ যান্ত্রিক মানুষ; তার মধ্যে যেন আর মনুষ্যরক্তের জীবন্তত্ব নেই, সে এখানে একটি automaton—যান্ত্রিক মানুষ মাত্র। কিন্তু মনুষ্য সত্তা জীবন্ত যন্ত্র, মৃত নয়। কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়া বা বাস্তবকে গ্রহণ করতে গিয়ে দেহ মন একেবারে ছিঁড়ে যাওয়া—এও যেমন দেহ মনের ক্লৈব্য, তেমনি অল্পেতেই বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়া কিংবা মানুষকে জীবন থেকে একেবারে অনুপস্থিত করে দেওয়া—এও অসহিষ্ণুতা, অধৈর্য ও ঠুনকো মনের পরিচয়, জীবনের পক্ষে সেও বন্ধন। কিন্তু জীবনের

যে কোন একটিকে একান্ত করে তুললে, দুটোর সম্মিলিত ছন্দ বের করে না নিলে মানুষকে তা যন্ত্র করে তুলবেই। এই ছেড়ে যাওয়ায় কমলের প্রতিক্রিয়া একদিকে তার এই রক্ত-হীনতাই প্রকাশ করছে। সে বলছে, "ফিরে পেতে ওকে আমি চাই নে, সেবা করেও না, সেবা না করেও না। সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারব না।" বিপ্লবপন্থী কমল এইখানে আর একবার পরাজিত হয়েছে।

আশুবাবুর মনোরমাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছার বেলায়—যে শাস্তিতে মনোরমার ভবিষ্যতে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়—সে বেশ বুঝেছিল যে, ঐটেই সত্যিকার পথ নয় এবং সেইজন্যেই আশুবাবুকে বলতে পেরেছিল যে, তিনি যখন বুঝছেন যে মনোরমা ভুল করছে, তখন তার ভুলের সংশোধনের জন্য কোন পথ না রেখে চিরকালের মত আশুবাবু তার ফেরবার পথ বন্ধ করে দেবেন, এ কেমন? কিন্তু নিজের জীবনের ঘটনার বেলায়, শিবনাথের বেলায় সে বিবেচনা সে মনে রাখতে পারে নি। ফিরে পেতে তাকে সে চায় না, সম্বন্ধ তাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে সে পারবে না। সমগ্রতাবিচ্ছিন্ন একান্ত প্রাণেরই উপাসক বলে অমন কথা সে বলতে পারলে। কোনদিন কোন অবস্থাতেই আর তা জোড়া লাগবে না, মনের এ অবস্থা সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়, গতিপূর্ণও নয়। এ-ও তো আর এক রকমের বুড়ো মনেরই পরিচায়ক। একটি ক্ষণের জন্যও যাকে সত্যি করে একদিন ভালবেসেছি, তাকে কোনদিন মন থেকে একেবারে

অনুপস্থিত করে দেবার কোন অধিকার মানবধর্মের নেই—এ কথা ধ্রুব সত্য। বাইরে থেকে তা বিচ্ছেদ বা দূরত্ব আনতে পারে বা আনাবার প্রয়োজন হতে পারে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাকে একেবারে চিরদিনের জন্য অনুপস্থিত করে দেওয়া কোন মতেই চলতে পারবে না। অন্তর থেকেও তাকে বিদায় করে দিলে পশুর সঙ্গে মানুষের খুব বেশি তফাৎ থাকে না। তার জন্য চিরদিন পথ খোলা রাখতেই হবে। একমাত্র বঞ্চনাকেই মূলধন করে যে-শিবনাথ সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে চায়, কোনদিন কোন কারণেই সে-শিবনাথ উন্নততর জীবনের খোঁজ পাবে না, এমন কথা হতেই পারে না। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, স্তরে স্তরে উন্নততর, সমগ্রতর জীবনের কোন ধারণা কমলের ছিল না; তাই তো ভবিষ্যতের মিলনের আর কোন অবকাশই সে দেখতে পায় না। তার দৃষ্টির সম্মুখে কোন উদ্দেশ্য, কোন পারস্পরিক গড়ে ওঠাই ছিল না, তাই তার চলন ঐকদেশিক অসম্পূর্ণতার দোষে দুষ্ট। আশুবাবু-মনোমার বেলায় তার যে বিবেচনা ভবিষ্যতকে অস্বীকার করে নি, সে বিবেচনা তো তার শিবনাথের বেলায় দেখা দিল না। সে তো বলতে পারলো না যে, ভবিষ্যতের কোন বিশেষ অবস্থায় তাদের সম্পর্ক আবার জোড়া লাগতেও বা পারে। জীবনে যা তার নেই, সেই না-থাকার পরিপূরণের জন্য কোন বোধ বা সংকল্পও তার নেই।

আর শিবনাথের বিরুদ্ধে কমলের উষ্মাও নেই, একথাও ঠিক থাকে না। ছিঁড়ে যে যায়ই, সেটা অন্তঃসলিলা উষ্মারই প্রতিক্রিয়ায়। শিবনাথের সম্বন্ধে এ ঔদাসীন্য তার অন্তরেরও অন্তরে উষ্মার ও অভিমানের রেশেরই সন্ধান দেয়। তা না থাকলে সম্বন্ধ ছিঁড়েই যেতো না। কিন্তু এতখানি গভীরের কথা কমল ধরতে পারে নি। তবে মনের সচেতন স্তর পর্যন্ত সে ঠিক কথাই বলেছিল।

জোড়া লাগবে ভবিষ্যতে কিসের জোড়ে? বিধাতার সৃষ্টির পটভূমিকায় অনুস্যূত যে সমগ্রচুম্বিত প্রেম, কমলের ভালবাসা তো তা নয়। সেই বিচ্ছিন্ন ভালবাসা তাই তো ছিঁড়লেই ছিঁড়ে যায়। কিন্তু জীবন্ত যন্ত্র এই যে আমাদের জীবনটা, এর পক্ষে তা সত্য নয়। সতীবিরহে শিব উন্মাদ হয়েছিলেন; সতীর মৃত্যুর সঙ্গেই সম্পর্ক তাঁদের ছিঁড়ে যায় নি। শিবের বেদনা জন্ম দিল গৌরীকে। সতীই গৌরী হয়ে এলেন। কমল যখন বলে যে, শিবনাথের প্রতি কোন অভিমানের জ্বালা, কোন বিদ্বেষ সে জিইয়ে রেখে দেয় নি, তখন সে কথা যতখানি সত্য, সেটুকু প্রমাণ করে সে গতিধর্মাত্মক। কিন্তু সম্বন্ধকে শেষ না করে দিয়েও যখন সে পারে না, তখন বুঝি প্রীতির অবকাশ রাখতে না পেরে গতি তার স্তব্ধ হয়ে গেল। তার বুদ্ধি যে-উপদেশ আশুবাবুকে জোগাতে পারলে, সে-উপদেশ নিজের বেলায় কার্যকারী করে রাখতে সে পারলে না কেন? তাই তো

বলতে হয় বুদ্ধিতে সে অনেক বুঝলেও কার্যক্ষেত্রে সে একেবারে গতিধর্মী, নিছক ধ্বংসাত্মক।

শিবনাথের সম্বন্ধে কমল জীবনের যে-স্তরের পরিচয় দিয়েছে, আর এক স্তর এগিয়ে গেলে যে ভাঙা সম্বন্ধকেও জোড়া দেওয়া চলতে পারে, সে কথা অন্ততঃ বলতেও না পেরে সে আরও বৃহত্তর স্তরের খোঁজ দিতে পারে নি। শিবনাথ যদি বদলাতে না পারে, তবে একা কমলের বদলালেই কাজ হবে না ; তবু সেই বৃহত্তর জীবনের খোঁজ যে কমল পায় নি, একথায় কোন সন্দেহ নেই। নিজকে এবং অপরকেও ক্রমাগত গড়ে তুলতে তুলতে, সৃষ্টি করতে করতে নূতনতর ভবিষ্যতে নূতনতর জীবনে চঞ্চল স্থিতি লাভ করবার মনোবৃত্তি না থাকলেই তো যা ছেঁড়ে, তা ছিঁড়েই যেতে পায়। ধরে রাখতে হলেই স্থিতি চাই। কিন্তু সে তো কমলের রক্তের মধ্যে নেই, সে রাখবে কি দিয়ে ? কিংবা সে যে ভালবেসেছিল, সে শুধু ভাল-বাসারই জন্যে ; সমগ্র জীবনের মূল্যের হিসেব যদি তার থাকতো, তাহলে অত সহজে মানুষকে সে পেতোও না, অত সহজে ছাড়তেও পারতো না।

কোন একটি বিশেষকে আঁকড়ে থাকা যেমন মানুষের পক্ষে বন্ধন, তেমনি একটি বিশেষের মধ্যেই যদি নির্বিশেষকে আস্বাদন না করা যায়, বহু বিশেষের বৈচিত্র্য-মাধুর্য যদি সেই এক-বিশেষের মধ্যেই ফুটে না ওঠে, তবে বহু-বিশেষের পিছনে পিছনে ছোটা মানুষের দেহমনপ্রাণ সমস্ত সত্তার পক্ষেই

গ্লানিকর ও শ্রান্তিময়; এবং জীবনের পক্ষে তা-ও তুল্য বন্ধন। কমলকে শিবনাথ পরিত্যাগ করল কেন? কমলের মধ্যে প্রজ্ঞার একত্বের সৌন্দর্য, স্থিতির শ্রান্তিহীনতার আশ্রয় পাওয়া যায় নি; তাই তো অত রূপেও কুলাল না, কেবল চলতে পারার ধর্মে ধরে রাখতে পারা গেল না। তাই তো অজিতও কমলকে ভাল-বেসে আনন্দ পাচ্ছে না।

যেদিন কমল অজিতকে জানালে, পরম দুঃখের দিনে যখন সবাই তাকে ঘৃণায় দূর করে দিয়েছে, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ ছিল না, সেদিন সেই পরম দুঃখের দিনে সুন্দর শিল্পকাজটুকু, ঐ ফুললতাপাতাটুকু রাত্রি জেগে, অলক্ষিতে, নিজেরও অজানিতে যাকে স্মরণ করে কমল রচনা করেছিল সে অজিত, তখন সে কথা শুনেও অজিত কোন উত্তরই দিতে পারে নি। শুধু একটা আরক্ত আভা তার মুখের পরে দেখা দিয়ে চক্ষের নিমেষে নিবে গেল। কমল কিছুক্ষণ নীরব থেকে জিজ্ঞেস করলে, "চুপ করে কি ভাবচেন বলুন তো?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারছি নে।

তার কারণ?

কারণ? তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধু ঝড়, না এলো আনন্দ, না এলো আশা।"

কিছু পরে অজিত বলছে, "মনে হয় তোমাকে পাওয়াও

আমার যেমন সহজ, হারানোও তেমনি সহজ।······তোমাকে আজ পাওয়াই তো শুধু নয়, একদিন যদি এমনি কোরে হারাতেই হয় তখন কি হবে?”

—এ প্রশ্ন মানবাত্মার সত্য, মৌলিক ও চিরন্তন প্রশ্ন। একদিন যে পাত্রকে ঘিরে বিশেষ দেশে ও কালে আমার আত্মা নানা প্রকাশ লাভ করেছে, বিচ্ছুরিত, বিকশিত ও আনন্দিত হয়েছে, আর একদিন সেই দেশকালপাত্র যাবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে? মনুষ্যসত্তার এ যে কত বড় বেদনা, কত বড় গ্লানির কথা, তা প্রতি মানুষের সহজ আন্তরধর্ম সাক্ষ্য দেবে। একান্ত প্রাণধর্মীর কাছে, একান্ত জড়বাদীর কাছেই শুধু এ সম্ভব। তাজমহলের নীচে শিবনাথ যেখানে কমলকে আশুবাবুর জরাগ্রস্ত মনটাকে শ্রদ্ধা করতে বললে, এবং কমল যখন তার উত্তরে প্রশ্ন করলে, “এ তুমি বোলচ কি আজ,” তখনই একদিকে যেমন তা প্রজ্ঞার স্থিতির প্রতি শিবনাথের সহানুভূতি, এবং সেই সূত্রে কমলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের ইঙ্গিত প্রকাশ করছে, তেমনি অপর দিকে তা কমলের প্রাণধর্মের একান্তত্বও প্রমাণ করেছে। অজিত যখন এক দিন হারাতে হতে পারার ভয়ে পাওয়ার আনন্দও উপভোগ করতে পারছে না, তখন তা একদিকে যেমন তার আটকে পড়ার অসৌন্দর্য প্রমাণ করে, তেমনি ভাল-বাসার পাত্রের মধ্যে চিরদিনের স্থিতি লাভ করবার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকেও প্রকাশ করে।

শিবনাথ গেছে, অজিতকেই কি কমল সত্যি করে রাখতে পারবে? কি দিয়ে সে রাখবে তাকে? রাখবার বিদ্যে তো তার জানা নেই, সে জানে কেবল চলতে, নিছক ধ্বংস করতে। তাই তো হরেন্দ্র যখন বলেছে, "পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালবার বিদ্যে শেখো নি", তখন সে অত্যন্ত সত্য কথাই বলেছিল। এর ঠিক জবাবটা দিতে না পেরে পাশ কাটিয়ে কমল বললে, "আলো পথের ওপর না পড়ে চোখের ওপর পড়লে খানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেবায়, তাকে বন্ধু বলে জানবেন।" কিন্তু এ তো হরেনের কথার জবাব হলো না। যে আলো চোখের উপর পড়ে খানায় পড়বার অবস্থা ঘটিয়ে তোলে, সে আলো যে নেবায়, সে বন্ধু বটে, এবং সে হিসেবে কমল সত্যিই আমাদের পরম বন্ধুজন। কিন্তু এতে নেবানোর কৌশলই শুধু কমল জেনেছিল, জ্বালাবার বিদ্যে শেখে নি —এ-কথার তো উত্তর হল না। কমল তো বলতে পারে নি, জ্বালাবার বিদ্যের কোন প্রয়োজন নেই, নেবাতে পারলেই সৃষ্টিধারা অব্যাহত চলতে থাকবে।

অনন্ত অতীতের দোললীলায় দোল খেতে খেতে যে-মানুষ বর্তমানে এসে দাঁড়াল, সে আবার কালের দোলায় তেমনি দুলতে দুলতে অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে—এই যদি হয় মানুষের চলার তত্ত্ব, তবে সে তত্ত্ব কমলের জানা নেই। আমরা আগেই বলেছি, ঘরের

বিশ্রামের কোণটুকুর অবকাশ না রেখে যে শুধু চলতেই বলে, সমস্ত চলার নূতন নূতন বৈচিত্র্যের অন্তর-অনুস্যূত চিরকালীন একত্বকে যে না বের করে নিতে পারে, অনন্তকাল চলা তার ঘটবেই না, ঘটতে পারেই না। কিছুদূর গিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়বে, মনস্তত্ত্বের সনাতন খোঁচায় বসতে সে চাইবেই। তারপরে একদিন যে কোন অবস্থা, ঘটনা বা বস্তুকে আশ্রয় করে বসে পড়তেও বাধ্য সে হবেই। কেন না প্রথম থেকেই চলার সঙ্গে না-চলার, নেবানোর সঙ্গে জ্বালাবার, ধ্বংসের সঙ্গে রক্ষার ধর্মকে একত্র মিলিয়ে নেয় নি বলে মাঝপথে নূতন কথা যখন আত্ম-প্রকাশ করবে, তখন আর তাকে মেলাতে পারা যাবে না, আর তার সহজ স্বচ্ছন্দ রূপ ধরতে পারবে না, আর সে চলতে পারবে না, স্থানে অস্থানে যেখানেই হোক্ বসে পড়তে তাকে হবেই।

বসে কমল পড়েওছিল।

কি দিয়ে অজিতকে সে রাখবে? সচেতন কিংবা অচেতন যেভাবেই হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষের চলনই সমাজমনকে কিছু না কিছু গড়তে গড়তে চলে যেখানে সমাজসত্তা ভবিষ্যৎ সূত্রের সঙ্গে বিধৃত হয়ে যায়। এই ভাবে গড়তে হলে মানুষকে অতীতের সূত্রে বর্তমানের ফুলের মালা গাঁথতে হয়। এ যেমন কালে, তেমনি মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধের বেলাতেও। কমলের জীবনে এক নেই বলে, স্থিতি নেই বলে reconstruction of life, revaluation of life-values—জীবনের পুনর্গঠন,

জীবনের মূল্যের পুনর্বিবেচন—বলেও কিছু নেই। তাই অপরকে ধরে রাখবার তার কোন সূত্রই নেই। প্রতি মনুষ্যসত্তার পুনর্গঠনের, পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নূতনতর ভবিষ্যতে যে অগ্রগমন, তারই মধ্যে একজন অপরকে ধরে রাখবার সূত্র পায়। জগতে এ চিরদিনই সত্য, তবু বিপর্যস্ত সমাজে এ আরও সত্য। কেন না নরনারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই মানব-সভ্যতার সব চেয়ে সত্য ইতিহাস তখনই, যখন সে ভালবাসা সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রেমের আনন্দই জগতকে ধরে রেখেছে এ খুব সত্য, কিন্তু সে প্রেম জীবনের সমগ্রতার ; বিচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তির খেপামির খেয়াল সে নয়। বিশ্ব-জীবনের অন্তঃমূলে যে প্রেম, সে প্রেমে ক্ষণের স্পন্দনের সঙ্গে চিরকালীন স্পন্দন বিজড়িত ; তাইতে সে ধারণ করতে পারে, তাইতে সে মানব-সভ্যতার ইতিহাস রচনা করতে পারে। সমস্ত ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সে গড়তে গড়তে চলে, নয়তো কবে সে লোপ পেয়ে যেতো।

কিন্তু কমল তো স্থিতির জড়ত্বকে, বুড়ো মনের অচলতাকে ধ্বংস করার সাথে সাথে গড়ে তুলতে পারছে না কোন চঞ্চল স্থিতি। কালের এমনি চলনের মধ্য দিয়ে কোন্ মহাশূন্যে গিয়ে সে দাঁড়াবে? সে কিছু রচনা করবে কি দিয়ে? রচনা করতে হলেই যে একটা সূত্র অতীত থেকে ভবিষ্যতে প্রলম্বিত হয়ে আসে; তার তো সে সূত্র নেই। কমল অজিতকে রাখতে পারবে না, কিংবা অজিত কমলকে রাখতে

পারবে না। দুরন্ত প্রাণের উন্মাদনায় এমনি সে কতদূর চলতে পারবে? ক্লান্তি আসবেই—দেহেরও, মনেরও। দেহ অপেক্ষা মন আরও খানিকটা বেশি দূর চলতে পারতে পারে, তবু প্রাণের এক পক্ষে ভর করে মনুষ্য-সত্তা খুব বেশি দূর এগোতে পারবেই না।

একত্ববিহীন একান্ত বহুত্ব ব্যভিচার বই আর কি? তার সার্থকতা কিছুই নেই। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তের পদে পদে সত্য নিত্যনূতন রূপে দেখা দেয় বটে, সবাই তাকে চিনতেও পারে না। ভাবে বটে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিনের তাজমহলের ছায়ার নীচের শিবানীকে আজ কমলের মাঝখানে আর চিনতে পারাও যাবে না সত্য, মনেও হবে বটে সেদিন যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে? কমলও বললে, "এ-ই মানুষের সত্য পরিচয়—এমনি ভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি।" কিন্তু এই-ই মানুষের একমাত্র সত্য পরিচয় নয়। সমস্ত বদলের মধ্যেও একটি চিরকালীন মানুষ আছে, প্রতি দিবসের রূপান্তরিত মানুষের মধ্যে একটি চির দিবসের মানুষ আছে, তাকেও খুঁজে বের করে নিতে না পারলে মানুষের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তাজমহলের ছায়ার নীচে যে শিবানী ছিল, শিবনাথ-পরিত্যক্ত কমলের সাথে তার অনেকই অমিল, কিন্তু তবু তারা একটি মানুষই তো? সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যকে কমল কিছুতেই দেখতে

পাচ্ছে না। আশুবাবুরা আবার এই ঐক্যের সূত্রটিকেই একমাত্র করে দেখছেন। সমস্ত ক্ষণবিভিন্নতার ভিতর দিয়ে যে একই বস্তুর আত্মপ্রকাশ। তাজমহলের নীচে শিবানীরূপে যে ক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, তার সেই ক্ষণের বুকে শিবানী-অতীতও একটী সত্তা আছে; তাইতো সে পরের কমলরূপেও আত্মপ্রকাশ করতে পারলো।

কমল বলেছিল আশুবাবুকে, "সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভেতরের দাহ আজও তেমনিই জ্বলচে, তেমনি কোরেই ছাই করে আনচে; এ নিববে কি দিয়ে?" অত্যন্ত সত্যকথা। নারীর আন্তরদাহ আজকের সমাজেও তেমনি আছে বলা যায়, যেমন ছিল সে শতেক বৎসর আগে। এ দাহকে কি শুধু আইনের শাসনে বদলানো যাবে? ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান যেদিন নির্দিষ্ট হয়েছিল, সেদিন তো তা আইনের শাসনে নির্দিষ্ট হয় নি, মুনিঋষিদের জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ তাকে শুধু আইনের শাসনে নেবাতে চাইলেই সে নিববে কেন? যে চিন্তা-ধারার যে গ্রহণের ফলে সমাজদেহে সতীদাহের বিষফোঁড়া গজিয়ে উঠেছিল, এবং আজও নানা আকারের বহু দুষ্টব্রণ যে নারীকে পীড়িত করছে, সেই চিন্তাধারাকে মূলেই ঐ বিষফোঁড়াগুলি গজিয়ে না ওঠবার মত করে না তুললে বাইরে থেকে পুলটিস প্রলেপের চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে না? কিন্তু কমলই কি পারবে সতীদাহের অন্তরজ্বালা নেবাতে? তার চিন্তাধারা দিয়ে যদি

কোন সভ্যতা দাঁড় করানো যায়ও, তবে সেদিনও নারী-সত্তার দহনের শিখা আকাশ স্পর্শ করতে দেখা যাবে পূর্বের সতীদাহের আগুনের মতই।

কমলের কথা শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আশুবাবু বলেন, "কমল, মণির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারি নি, তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্বলতা—কি জানি সে কি। কিন্তু এ মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানিই সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন।" এ যে মানুষের কি এবং কত তপস্যার ধন, তা বুঝবার সাধ্য কমলের নেই। এ স্থিতিভূমি তার জীবনে নেই বলেই তো তাজমহলের তলায় বসে শিবনাথের দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল, আর সেইজন্যেই তো অজিত ভাল না বেসেও পারছে না, ভালবেসেও আনন্দ পাচ্ছে না।

অজিত বলেছে, "বিলেতে থাকতে দেখেছি ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালোবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব করে কিসের?"

কমল উত্তর দিলে, "বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন, হয়তো তত সহজ নয়; কিন্তু তবুও কামনা করি নর-নারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।"

জড়বাদী পশ্চিম সভ্যতা প্রাণধর্মী; তাই সে সহজে ছেড়ে যায়। শেষে ওটা একান্ত হয়ে পড়ার দরুণ ও একটা রোগ

বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়, যা আজ হয়েছে সেখানে। তাই তারাও হাঁপিয়ে উঠেছে, তারাও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তারাও ছেড়ে যেতে না-হওয়াটা চাইছে। ছেড়ে যাওয়াটাও একটা রোগ, কোন দিন কোন কারণেই ছাড়তে না-পারাটাও একটা রোগ—দুইই fixation—আটকে পড়া। আশুবাবুর বদলাতে না-পারা আর কমলের বদলানো ঠেকাতে না-পারা দুইই rigidity—কাঠিন্য ;—সহজ সমগ্র জীবনের পক্ষে দুইই বন্ধন। আশুবাবু একেতে দৃঢ় হতে গিয়ে কঠিন হয়ে পড়লেন, বহুর সম্ভাবনাকে ঐকান্তিক স্বীকারের কোমলতা কমলকে আর একরকমভাবে কঠিন করে তুললো। কাঠিন্যই মৃত্যু, কোমলতাই জীবনের লক্ষণ। এই দুই অনমনধর্মশীলতাই জাগতিক ধর্মের চরম মৃত্যুর বান ডেকে আনে। নর-নারীর পরিচয় যে অর্থে একদিন কমল জগতে আলো বাতাসের মত সহজ হয়ে যাবার কামনা করেছে, সে তার পক্ষেই সম্ভব ; কেননা ছেড়ে যাওয়া এবং ছেড়ে না-যাওয়া এই দুইয়েরই সমন্বয়েও যে সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে, এ খবর তার জানা নেই। শুধু ছাড়তে পারার ওপরেই কোন সভ্যতার জয়যাত্রা কামনা করা আজ আর বিপ্লব নয়, কেননা সমন্বিত ছন্দের বার্তা আজ পৃথিবীর আকাশে বাতাসে।

কমল অন্যত্র হরেন্দ্রকে বলেছে, "অতবড় জাত যদি মাথা নিচু কোরে পড়ে, তার ধূলায় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দিন।" দুর্দিন তো বটেই ; মানব সভ্যতার ভাণ্ডারে সে যা দিতে পারে এবং দিয়েছে, তার মূল্য অনেক। কিন্তু

সে যা দিতে পারে না, সে সম্বন্ধেও সচেতন না থাকা বিপ্লবধর্ম নয়। অন্যত্র কমল সতীশকে বলেছিল, "...পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।" কমলের কথা দিয়েই আমরা কমলের এ কথার জবাব দেব। একটু আগেই সতীশকেই কমল বলেছে, "মন্দ তো ভালোর শত্রু নয়, ভালোর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভালো—সে, সেই আরো-ভালো যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হুন, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোড়ে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারে নি, তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগলপাঠানের পরীক্ষা বাকি রয়ে গেল ফরাসি-ইংরেজ এসে পড়লো বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে।"

—এমনিই হয়। এই বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেককে বেঁচে থাকতে হয় যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে। সে যোগ্যতা শক্তির দম্ভ নয়; কেননা সে দম্ভও একরকমের দুর্বলতাই। বিশ্বপ্রকৃতি স্তরে স্তরে যে লীলা-বৈচিত্র্য উদঘাটিত করে দিচ্ছে, যে সভ্যতা যত বেশি সেই

লীলাবৈচিত্র্যের অতল গহনে অবগাহন করতে পেলে, সে-ই ততবেশি প্রকৃতির কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে। ভালোর শত্রু আরও ভালো। পশ্চিম যা দিয়েছে, তা ভালো। কিন্তু প্রাচ্য-প্রতীচীর সমন্বয় করে ভারতবর্ষ আরও ভালোর সন্ধান আজ পেয়েছে। সেই আরও ভালো নিয়ে যদি সে বিশ্বের সামনে দাঁড়াতে পারে, তবেই সেই আরও ভালোর সামনে পশ্চিম তার শুধু ভালো নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আজ যদি ভারতবর্ষ অপরিহার্য অজড়বাদের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য জড়বাদের সভ্যতাকেও সমমূল্যে গ্রহণ করতে পারে, যে সম্ভাবনার স্পন্দন আজ ভারতে দেখা যাচ্ছে, তবে উভয়ের সম্মিলনের সেই আরও ভালোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিম কি শেষ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, অধিকতর কল্যাণের পথ দেখাতে পারবে?

হরেন বলেছিল, "…আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতের সেই শিক্ষকের আসন অধিকার করবে…।" করবে এবং করবার সামর্থ্য ও সম্পদ তার আছেও; কিন্তু সে সম্পদের খোঁজ হরেনেরও জানা নেই। ভারত তার অতীত সভ্যতায় সভ্যতার যে রূপের খবর দিয়েছে, তাতে করে বর্তমান যুগধর্ম্মের জটিলতার সামনে শেষরক্ষা সে করতে পারবে না। জড় আর অজড়ের এই দুই সভ্যতার সমন্বয় তাই আজ দরকার হয়ে পড়েছে, এবং জীবনের মধ্যে সে সমন্বয় করতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ভারতবর্ষই পারবে।

বলেছিলাম, বসে কমল পড়েওছে। আশুবাবুর গৃহে আপাদসিক্ত কমলের মনোরমার সঙ্গে চটুল বাক্যালাপ আর আশুবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্বচ্ছ স্নিগ্ধ দুই চারিটি কথার সেই প্রথম দিনটি মনে পড়ে? মনে পড়ে তাজমহলের নীচে শিবনাথের স্ত্রী শিবানী-কমলের প্রাণপ্রাচুর্যের সেই উচ্ছলতা, সেই ঝরণার বারিপতনের কলকল্লোল? সকলের স্তব্ধ বিহ্বলতার মধ্যে মনে পড়ে কমলের সেদিনের সেই তেজোদৃপ্ত ঘোষণা যে, শিবনাথ যদি তাকে বিয়ে হয় নি বলে অস্বীকারও করে, তবু "আমি আত্মহত্যা করতে যাবো একথা আমার বিধাতা-পুরুষও ভাবতে পারেন না?" আর এই সঙ্গেই মনে পড়ে কি শেষ দিনের শেষে বৈঠকে বিয়ের জন্য অজিতের বারংবার মিনতির উত্তরে কমলের উক্তি? অজিত বললে, কমল তাকে বাঁধতে চায় না বটে কিন্তু সে যে চায়, কিন্তু অজিতের সে জোর কই? কমল উত্তর দিলে, "জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা কোরতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।"

—সেই প্রথম দিনের উচ্ছলিত কলকল্লোলের সঙ্গে এর মিল কোথায়? সেই উদ্দাম প্রাণ-চাপল্য, যা সদা-প্রফুল্লতার

কুণ্ঠাহীনতায় উজ্জ্বল, তা এখনি কোথায় গেল? এ কি সেই কমল? অজিতকে গ্রহণ করবার মধ্যে তো কমলের সেই তেজোদৃপ্ত প্রাণের সেই উচ্ছলতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তার গতি যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে। এ যেন তার নিতে হবে বলেই নেওয়া। দুর্বলতা দিয়েই বেঁধে রেখো—একি কমলের মুখে শোভা পায়? আর দুর্বলতা দিয়ে কি কেউ কাউকে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারে? আরম্ভণের দিনে যাত্রা-আরম্ভ কোন দুর্বলের সঙ্গে সম্ভব; কিন্তু সে যদি সবল না হয়ে ওঠে, তাকে যদি সবল করে না নেওয়া যায়, তবে তার সঙ্গে কি চিরদিনের জন্য বন্ধন সম্ভব, না বাস্তব? সে তো নেহাৎ বোঝা, নেহাৎ দায় ছাড়া আর কিছুই নয়। কমলের চলা যে ফুরিয়ে এসেছে, সে যে শ্রান্ত হয়ে আটকে পড়ছে, সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অজিতের মত মানুষকে ভাসিয়ে যাওয়া যেন তার না ঘটে—একথা না বলে একান্ত গতিধর্মী কমলের বলা উচিত ছিল, যেতে যদি তাকে হয়ই, যাবেই সে। ভগবানের কথা তো কমলের কোনদিন মনে পড়ে নি, আজ তবু কেন সে কথা তার মনের কোণেও এল?

বিদায় হয়ে যাবার আগ মুহূর্তে হরেন বললে কমলকে, "এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে, কমল তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল···পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না।"

কিন্তু লেখক লিখছেন, "কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই বিধান।"

এমনিই কেন হয়, সে কথাই আমরা এতক্ষণ ধরে স্পষ্ট করে তুলেছি। ঐকান্তিক হৃদয়ধর্মের পরিণতিস্বরূপ কমলের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ায় এ শ্রান্তি টেনে এনে লেখক জীবনতত্ত্বের যে ইঙ্গিত রেখে গেলেন, তার কঠিন সত্যতা আমাদের চৈতন্যোদয় ঘটাক্। একান্ত প্রাণের গতি যে একদিন স্তিমিত হবেই, সেই কথাটি তুলে ধরে লেখক অসীমের আহ্বান ডেকে আনলেন।

যাই হোক, সমস্ত বইটির মধ্যে ঘুরে ঘুরে যে বিবাদটা আত্ম-প্রকাশ করেছে, সেটা হচ্ছে এককথায় ক্ষণের সঙ্গে চিরকালীনত্বের, একের সঙ্গে বহুর। দু পক্ষেরই স্বতন্ত্র যৌক্তিকতা দেখিয়ে এতক্ষণ আমরা অনেক কথাই বলেছি। সমগ্র জীবনের মধ্যে একত্ব ও বহুত্ব দুইই তুল্যমূল্য, দুইই অপরিহার্য; অথচ দুইই সাপেক্ষ, পরস্পরের পরিপূরকতায় সম্পূর্ণ অভিনব। আস্বাদনে সাদৃশ্য যেমন প্রচুর, বৈসাদৃশ্যও তেমনি। সহজ জীবনের এটাই একমাত্র তত্ত্বকথা। এ বিশ্বে একান্ত একত্ব বা একান্ত বহুত্ব কিছুই একান্ত সত্য নয়। জীবন সমগ্রের আস্বাদনের জন্য পাগল; অথচ সমগ্র লীলাস্বাদনের জন্য অনন্ত সমগ্র খণ্ডে খণ্ডিত সে হবেই। প্রবৃত্তিও ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন রূপেই প্রকাশ পায়।

প্রতি মানুষের মধ্যে এই যে পরস্পরবিরোধী একত্ব ও

বহুত্ব—এ দু'য়ের মিলনেই মানুষের সমগ্র সত্তা। মানুষ একের অতল গহনে অবগাহনের স্থিতি চায়; আবার সেই মানুষেরই বহুর নব নব বৈচিত্র্যের আস্বাদনের আকুল পিপাসা। কেননা মানুষের স্বরূপ হচ্ছে সে বসে বসেও চলে। তাইতো উপনিষদ বললেন, "আসীনঃ দূরং ব্রজতি।" বিশ্বের বহুর আস্বাদন যে তারই সত্য অপরার্ধ একধারাকে জড়িয়েই সার্থক। জীবনের মধ্যে এই দুইকেই তাদের যথামূল্যে স্বীকার করে কোন সভ্যতা দাঁড় করাতে চাইলে প্রতি এক-মানুষকেই প্রতি বহু-মানুষ হতে হবে, বহু-রূপ বিশ্বরূপ হতে হবে। প্রতি মানুষ যখন বহু-এক-মানুষ, তখনই শুধু মানুষের মধ্যের একত্ব ও বহুত্বের পরস্পরবিরোধী আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির মধ্যে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। মানুষ স্বরূপে এক, বিশ্বরূপে বহু। স্বরূপে সে গভীর, বিশ্বরূপে সে বিস্তীর্ণ। এই স্বরূপ ও বিশ্বরূপ উভয় মিলিয়েই মানুষের সমগ্র স্বরূপ; এবং এই সমগ্র স্বরূপের দৃষ্টান্তই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

তাই শেষ প্রশ্নের শেষ সমাধান এই যে, নরনারীনির্বিশেষে প্রতি মানুষ যদি তার সত্তার স্বরূপ-বিশ্বরূপের গভীর-বিস্তীর্ণ-মুখীনতাকে ক্রমাগত ফুটিয়ে তুলে তাকে আস্বাদন করবার প্রচেষ্টায় সামনের দিকে এগিয়ে না চলে, তবে নরনারীর জীবনের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, আকস্মিক বা ধারাবাহিক কোন ট্রাজেডিকেই আর কিছুতেই ঠেকান যাবে না। নর যদি তার একত্বের গভীরতার আশ্রয় আর বহুত্বের নিত্য নব বৈচিত্র্যের পরিভ্রমণ কোন একটি

নারীতে লাভ করে, তবে আর তার সামগ্রিক সত্তার পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা দিকে দিকে বহু নারীর খোঁজে অর্থহীন ভ্রমণের দ্বারা দেহমনের গ্লানিকর শ্রান্তি টেনে আনবে না। অপরদিকে নারীও যদি তার সামগ্রিক সত্তার আস্বাদন তিলে তিলে একজন পুরুষের মধ্যেই লাভ করতে পায়, তবে সে-ও তখন একদিকে তার সংগঠন শক্তি আর একদিকে তার সংহার-শক্তিকে অনর্থক বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে না ফেলে সমস্ত সংহত শক্তি নিয়ে ভবিষ্যতের গর্ভে যাত্রা করতে পারবে। নারীর সকল সৌন্দর্য-মাধুর্য তখন একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠনে নিয়োজিত হয়ে দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে।

এমনি ভাবে একদিকে যেমন মানুষের সকল শক্তির, সকল বৃত্তির সহজ বিক্রীড়ন লীলায়িত হয়ে উঠতে পারবে, আর একদিকে তেমনি প্রতিটি বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নতার অন্তরস্থুপ্ত অতীত সত্তার আস্বাদন ঘনায়িত হয়ে উঠে তাকে বস্তুর বস্তুধর্ম লাভ করাবে। কমল আর শিবনাথ যদি পরস্পরকে সমগ্রের দিকে এমনি করেই গড়ে তুলে এক-বহুর আস্বাদনকে সম্ভব করতে পারতো, তবে শিবনাথের কমলকে ছাড়তে হতো না, কমলেরও শিবনাথকে ছেড়ে অজিতকে আশ্রয় করার দরকার হতো না। তেমনি আবার কমল যদি অজিতকে নিয়েও এই এক-বহু হওয়ার সাধনা গ্রহণ করে, তবে অজিতের পর আর একজনকে নিয়ে তার শ্রান্ত ক্লান্ত হওয়ার প্রয়োজন ঘটবে না।

প্রতি বিশেষকে বহু বিশেষ হয়েই নির্বিশেষ হওয়া ছাড়া আজ আর উপায় নেই। একটি সমগ্র-চুম্বিত বিশেষের মধ্যে যখন বহু দেশ, বহু কাল ও বহু পাত্রের নিত্য নূতন সন্ধান পাওয়া যায়, তখন সেই বহুর মধ্যে অবগাহনের পরে আর সামাজিক মানুষের বিশেষ কিছু চাওয়ার থাকে না। আমার একদিনের দেশকালপাত্র আর একদিনে যাবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, এ-ও যেমন মানবাত্মার গভীর বেদনার কথা, চিরকাল যে-কোন কারণেই, যে-কোন অবস্থাতেই বহু হওয়ার যোগ্যতাহীন একটি বিশেষ দেশকাল-পাত্রকেই একান্ত করে চিহ্নিত করে রাখতে হবে, মানবাত্মার এ-ও পরম বন্ধনের কথা। এই দুই দুঃখদায়ক অবস্থার থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে শুধু একের বহুত্ব। মানুষের জীবনে প্রেমের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত শুধু একটি মানুষকেই ভালবাসা বাস্তব ও সার্থক তখনই, যখন সেই একই বহু হয়, যখন সেই একেরই মধ্যে বহু দেশ, বহু কাল, বহু পাত্র ও বহু ঘটনার বহুযোগ্যতা এককালীন আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্ভব এই জন্যেই যে প্রতি বিশেষ, ক্ষুদ্র অণুটিও সর্ব। মানুষ যে নবীনের আকাঙ্ক্ষী ; যা একেবারেই পুরনো হয়ে যায়, তার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য হ্রাস পায়। কিন্তু নবীনের অনির্বচনীয়তার প্রতি তার একটি সহজ মোহ আছে। তাই তো পুরনো পরিচিত মানুষটিকেই নিত্য নবীন হয়ে দেখা দিতে হয়, নিজের এবং অপরের অন্তর বাইরের নূতন নূতন প্রয়োজনে নূতন করেই ফুটতে

হয়, চির পুরাতন নিজেকে বিশ্বের কাছে নূতন করে উপস্থাপিত করতেই হয়।

শিবনাথ রুগ্ন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে কমলকে বিয়ে করেছে। পরার্থে প্রাজ্ঞ নিজেকে উৎসর্জন করে থাকেন, কিন্তু শিবনাথ নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে। চিররুগ্ন স্ত্রী আজ শুধুই বোঝা। স্ত্রী চিররুগ্ন হলো কেন? এজন্য স্ত্রীর, শিবনাথের এবং তথা সমাজের দায়িত্ব কতখানি এই সব বহু প্রশ্নই এসে যায়। সমস্ত বিবেচনাকে ছাড়িয়ে শিবনাথের কাছে সেইটেই বড় হয়ে উঠল যে, চিররুগ্ন স্ত্রীকে নিয়ে সারা জীবন চালানো যায় না। স্ত্রীকে সে পরিত্যাগ করল। সে বলতে চায় একজনের জন্য আর একজন সারা জীবন দুঃখভোগ করবে কেন? যাকে দিয়ে আমার জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম কোন প্রয়োজনই মিটবে না, শুধু শুধু তাকে নিয়ে সারা জীবন দুঃসহ বোঝা বয়ে বেড়াব কেন? একদিক দিয়ে এ যুক্তির একটা অর্থ আছে বৈ কি। কিন্তু শিবনাথ তার স্ত্রীকে যেভাবে পরিত্যাগ করে পরবর্তী অবস্থাকে গ্রহণ করেছে, তাতে তার ঐ পরিত্যাগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ঘটনাকে বাদ দিলেই ঘটনা বাদ পড়ে যায় না। শিবনাথের কথার যে একটা যৌক্তিকতা আছে, একথা যেমন অনস্বীকার্য, তার রুগ্ন স্ত্রীরও একটা দিক আছে, এ কথাও যে কোন ক্রমেই অস্বীকার করে ফেলা যাবে না। মানুষ যখন সুখ আস্বাদন করে,

তখন অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়েই করে, দুঃখ ভোগের সময়ও অন্যের সঙ্গে করবে, এ কি খুব অসঙ্গত?

যদি প্রতি ব্যক্তি ও সমাজ এমন হতো যে শিবনাথের স্ত্রীর অমন চিররুগ্নতার দুর্ভাগ্য হতোই না, তাহলে সে খুবই সুখের কথা হতো এবং সেইটিই আকাঙ্ক্ষণীয়ও বটে। কিন্তু যে ট্রাজেডি ঘটে গেছে, তাকে বাদ দিয়েই তার সমাধান দেওয়া যায় না, বিরাট মানুষের পক্ষে তা কাম্যও নয়। সমস্ত ঘটনাই সার্থকতা পেতো যদি শিবনাথ অতীতকে রেখে, অতীতকে যথামূল্য দিয়েও ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করতে পারতো। একমাত্র তাহ'লেই প্রথম দিন নিমন্ত্রণ খেতে বসে যতগুলি কথা সে উচ্চারণ করেছিল, সেগুলির একটা যথার্থতা লাভ হতো। একান্ত স্বার্থপরতাও সত্য নয়, একান্ত পরার্থপরতাও সত্য নয়; এবং কোনটাকেই কোনটা ডিঙ্গিয়ে যেতেও পারে না। দুটোই যেখানে সমন্বিত, সেইখানে মানুষের সার্থকতা। শিবনাথ স্বার্থপরতার সার্থকতা লাভ করতে চাওয়ার সাথে সাথে পরার্থপরতার কথাটা ভেবে দেখে নি, সেইখানে সে মানবাত্মার অভিশাপ টেনে এনেছে। তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ তবু বা অর্থপূর্ণ হতো, যদি সে পরবর্তী ঘটনায় জীবনের সামগ্রিক প্রকাশের খোঁজ পেত; কিংবা তা হলে স্ত্রীকে তার পরিত্যাগ করতেও হতো না। কমল যে একান্ত বিচ্ছিন্ন প্রাণধর্মী তারও আর একটি প্রমাণ, শিবনাথের পূর্ব স্ত্রী তার পক্ষে যে কিছুই নয়, সেইটে। বিরাটের প্রকাশ যদি

কমলের মধ্যে থাকতো, তবে শিবনাথের পূর্বস্ত্রীকে তার যথাযোগ্য স্থানও সে দিতে পারতো। এ সংসারে কেউ একেবারে বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে থাকতে পারবেই না। যার যা মূল্য, তার স্থান ও সম্মান সে পাবেই।

শিবনাথেরও জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ সম্বন্ধে কোন বোধই ছিল না। সে বললে, কমলকে সে বিয়ে করেছে শুধু রূপের জন্য। কিন্তু রূপটাই যে মানুষের সবটুকু নয়, তাতে যে দেহমনব্রহ্মাস্বভাবধৃতিপ্রযত্নে জড়ানো মানুষের সমগ্র যৌগিক সত্তার পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই, সে কথা শিবনাথই প্রমাণ করে দিলে। কমলের অতুলনীয় রূপ ও তার সঙ্গে তার অনেক প্রেম যুক্ত করে শিবনাথকে ধরে রাখা যায় নি। মনোরমা তো কমলের রূপের কাছে শিশু। তাইতো বলতে হয় মনোরমাও যদি নারীজীবনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যসত্তার সমগ্রতার বিকাশ না করতে পারে, যদি সে গভীরতার আশ্রয় ও বৈচিত্র্যের পরিভ্রমণ স্বচ্ছন্দ করে গেঁথে তুলতে না পারে, তবে শিবনাথ-মনোরমার মিলনই কি টিকবে? তা না হলে এমনি মানুষ বদলাতে বদলাতে তারা কতদুর যাবে? এমনি বিচ্ছিন্ন ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির দ্বারা কোন সভ্যতাই কি দাঁড়াতে পারে? শুধু রূপ, শুধু মনের ভাল লাগা কিংবা শুধু যা কিছু, তার কোন একটিতে মিললেই যে শেষরক্ষা করা যায় না, এ কথাটা মনে রাখতে না পেরে জীবনের ট্রাজেডিকে তারা কোনমতেই ঠেকাতে পারবে না।

সেইজন্যে প্রতি মানুষকে প্রেমে বড় হতে হয়, জ্ঞানে বড় হতে হয়, কর্মে বড় হতে হয়, ভক্তিতে বড় হতে হয়। সেইজন্যে মানুষকে প্রেমে একসঙ্গেই বিস্তীর্ণ-গভীর হতে হয়, জ্ঞানে একসঙ্গেই বিস্তীর্ণ-গভীর হতে হয়, কর্মে একসঙ্গেই বিস্তীর্ণ-গভীর হতে হয়, ভক্তিতে একাধারে বিস্তীর্ণ-গভীর হতে হয়। স্বরূপে স্থিত হয়ে মানুষকে বিশ্বরূপ হতে হয়। এইখানেই বর্তমান যুগদেবতা পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালদেবের "I am a cosmopolitan"—আমি বিশ্বনাগরিক—এই মহাবাণীর আস্বাদন সার্থক।

এক মানুষ যদি তার সকল ক্ষুধার, সকল সত্তার, সকল ভাবনাজ্ঞানকর্মের ভ্রমণের পরিতৃপ্তির, অবগাহনের অবকাশ অপর একটি মানুষের মধ্যে না পায় বা সৃষ্টি করে না তোলে, তবে কোন একটি মানুষকে নিয়ে সারাজীবন কাটাতেই হবে, এমন বন্ধন মানুষ স্বীকার করে নিতে পারেই না। মানুষ যে ভূমার পূজারী। অথচ একত্ববিহীন মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো যে মানুষের পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের কথা। মানুষের কোন সত্তাকেই যখন কোন অস্বীকারেই না-ই করে ফেলা চলবে না, তার একের ও বহুর আকাঙ্ক্ষা যখন সমান সত্য, তখন এক মানুষেরই বহু রূপে আত্মপ্রকাশ ছাড়া অর্থাৎ প্রতি মানুষের সকল সত্তার সমন্বিত প্রকাশ ছাড়া মানুষের তৃপ্তি নেই। কমল জীবনের যে দিক প্রকাশ করেছে এবং আশুবাবু যেদিক প্রকাশ করেছেন—এ দু'য়ে মিলেই একটি

সমগ্র সুস্থ সভ্যতা দাঁড়াতে পারে। আর সেইখানে ঐকদেশিক মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার সমস্ত ট্রাজেডির অবসান। এ ছাড়া হয় এটা, নয় ওটার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ব্যর্থতা ঠেকানোর আর কোন পথই নেই।

প্রতীক্ষা করার সময় আশুবাবুদের অনন্ত, উপুড় হয়ে শুয়ে খাবার তাঁদের দরকার হয় না, সমস্ত পথ চলার শেষে জন্মান্তর কালে তাঁদের অভীষ্ট গন্তব্যস্থলের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা বসে থাকতে পারেন। আর কমলের এখানেই এখনই সব, তার গন্তব্যস্থল বলেই কিছু নেই। দুটোই বিচ্ছিন্নভাবে দেহমনের শ্রান্তি এনে দেবে। মানুষ যখন গন্তব্যস্থলকে তার পথের মধ্যে নিয়ে আসে, গন্তব্যস্থল যখন আর শুধু সমস্ত পথচলার শেষে, সমস্ত পথচলাকে খতম করে দিয়ে সুদূরের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষকে অনন্তের পানে হাতছানি দিয়ে ডাকে না, অশেষ পথচলার মাঝে পথের বাঁশি পায়ে পায়ে বেজে মানুষকে চঞ্চল করেও যখন তার আত্মারামত্বের একান্ত আত্মাস্বাদনে চ্যুত করতে পারে না, তখনই মানুষের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা। এবং এইজন্যেই মানুষের সকল সম্ভাবনাকে রূপ দিতে হয়।

আশুবাবু এক জায়গায় একটি অত্যন্ত সত্য কথা বলেছিলেন, "মনে হয় কিসের জন্যই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভাল-মন্দর বাদানুবাদ,—মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও

তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আনন্দ তো নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।" এই যে মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে আছে, আপন সত্তার বেদনায় তার নিজেকেই সে ভুলের আবরণ, সে ফাঁকির দেয়াল একদিন উন্মোচন করে দিতে হবে। কিন্তু আপন সত্তার সে বেদনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অনেকের পক্ষেই সহজ হয় না। তাই বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় মনুষ্যসত্তা যখন স্তরে স্তরে বিকশিত হতে থাকে, তখন সে প্রকাশের বেদনাকে সে ভয়ও পায়। মনে করে জানার মধ্যে তবু ছিলাম ভাল, অজানার দুঃখকে কেন ঘরে ডেকে আনা। কিন্তু উপায় নেই। আপন সত্তার অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে হলে অজানার দুঃখকে, যা সে ছিল না তা হওয়ার প্রচেষ্টার দুঃখকে জয় করে তাকে নিতেই হবে। এমনি করে দুঃখের মধ্য দিয়েই একের পর আর, ভালর চেয়ে আরও ভালর স্তরে বিশ্বপ্রকৃতি এগিয়ে চলে।

কমল বলছে আশুবাবুকে, "যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে, আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃত দেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি কোরেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্ম-বিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে।

এই তো মানুষের মুক্তির পথ।” সত্যিই এই-ই মুক্তির পথ। যা ছিল তা ভালই ছিল, তারপরে মনুষ্যসত্তারই বেদনায় দুঃখের জোয়ার এল। যা এল, তা-ও ভালই এল। কমল যা আনল মূল্য তার আছেই, তবুও আরও ভালর পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে বিদায় তাকেও নিতেই হবে। সেই আরও ভালর মধ্যে কমলকেও দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু কমলের সঙ্গে সেখানে আশুবাবুর একত্বের দেখাও মিলবে। কেউ যদি সৃষ্টির চলার এই ক্রমায়ণকে আরও ভাল বিশেষণে বিশেষিত করতে না চান, না-ই বা করলেন, কিন্তু গতিপথ তার এই-ই ; ভালমন্দের যাঁর যে রকম ধারণা, তিনি তাই দিয়ে একে অভিহিত করুন।